একটি বুদ্‌বুদ্‌

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীভোলানাথ দে

করকমলেষু,

ভাই ভোলানাথ—

আমার নিজের ভাই নাই, তুমি সে অভাব কোনদিন বুঝতে দাও নাই, সেই গর্ব্বেই আমার এই সামান্য উপহার তোমার হাতে তুলে দেবার সাহস পেলাম। ইতি—

—প্রসাদ—

পূর্ণিয়া।

বিহার।

এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক :—

—উপন্যাস—

বাস্তবের দু'পৃষ্ঠা—

যে ফুল না ফুটিতে—

তারা তিন জন—

ভারতীর প্রশ্ন—

ইহাই সত্য—

—নাটক—

মানময়ী বয়েজ স্কুল—

(নাট্যনিকেতন ও রেডিওতে অভিনীত)

—এপিক উপন্যাস—

(প্রথম স্তবক)

পৃথিবীর ছন্দ—

জনতার ইঙ্গিত—

আগামী প্রতিচ্ছবি—

(দ্বিতীয় স্তবক)

একটি বুদ্‌বুদ্‌—

রঙ্গীন প্রতিবিম্ব—

পরিণতি—

একটি বুদ্‌বুদ

শুধু জীবনের কর্ম্মচাঞ্চল্য নয়, আরও বিভিন্ন প্রকারের জিনিস মানুষের মস্তিষ্ককে চাপ দিয়ে জীবনের প্রতি পদক্ষেপকে দুর্ব্বিসহ করে' তোলে, দারিদ্র্য কিংবা কর্ম্মের অভাব এ বিষয়ে বেশই গণ্য; সুতরাং মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের সে গুরুভারকে লাঘব করবার জন্য স্নায়ুমণ্ডলীর আরাম ও শৈথিল্য প্রয়োজন, এই প্রকার শৈথিল্যের মুহূর্ত্তেই মানুষ তার শতাব্দী-পুরাতন ক্রম-বিবর্ত্তিত স্বকৃত সামাজিক সভ্যতাকে বিস্মৃত হয়ে নিজের আদি, সৃষ্টির আদি পশুত্বের প্রতি টলে পড়ে, বড় বড় মনীষী কোন কোন মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের জন্য এরূপ শিথিলতা ইচ্ছা করলেই হবে স্বাভাবিক, তেমনই কর্ম্মহীন মানুষ অলস মুহূর্ত্ত গণনা করতে করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে তাকে এই প্রকার দুর্ব্বলতার জন্য আপনি ক্ষমা করবেন। সমগ্র সৃষ্টির বর্দ্ধনই এই শিথিল-মুহূর্ত্তের উপর নির্ভর করছে—কিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলেছি যে আকৈশোর বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বপ্ন দেখে, জীবনকে উচ্চাশার সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করে' বহুদিন স্বপ্ন দেখে' অবশেষে পিতার আদেশে এবং স্বপ্নের ক্রম-বিলীয়মান অধ্যায়ে আমি সামান্য উকীল হ'য়ে আদালতকে অভিবাদন করলাম; পৃথিবীর অধিকাংশ উকীলের বোধ হয় একই কাহিনী; এবং সামান্য এইটুকু বলাতেই বোধহয় আমার পরিচয় অধিকাংশ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। রাসবেহারী কিংবা চিত্তরঞ্জন হবার আশা আজ উকীলের সংখ্যা ভারতে

বিশেষ বাংলায় অসংখ্যের পর্য্যায়ে এনে উপস্থিত করেছে।

সে অধ্যায়ের অধিকন্তু বিশ্লেষণ অর্থহীন!

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করে' কর্ম্মহীনতা আমার মস্তিষ্ককে শুধু অবসাদগ্রস্ত নয়, অসাধারণ স্তরের পর্য্যায়ে উপনীত করবার চেষ্টায় ছিল, মাঝে মাঝে মনে হত যেন সে অহমিকাপূর্ণ জীবন অপেক্ষা বিনাবেতনে সারাদিন পাথর ভাঙ্গার কাজ ভাল কিংবা কুৎসিৎ অপরাধের জন্য কারাগারে কঠিন পরিশ্রম বহুলাংশে শ্রেয়ঃ; কর্ম্মের অভাব, শুধু অর্থের অভাব নয়, মানুষকে উন্মাদ করতে রীতিমত সক্ষম।

আমি কাজ চেয়েছিলাম-অর্থ নয়, আমি গতি চেয়েছিলাম-স্থবিরতা নয়, আমি প্রাণ চেয়েছিলাম-মৃত্যু নয়।

এই প্রাণকে স্পর্শ করবার জন্য মাঝে মাঝে বর্ত্তমান সভ্যতার মিথ্যা আবরণকে দূর করে' পশুত্বকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করতাম, অত্যুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে সমাজের ক্লেদ বলে পরিগণিত হতাম।

একদিন এই পশুত্বকে স্পর্শ করে আমি কী পেয়েছিলাম সেই কাহিনীই আজ আমার সভ্য সমাজকে, বর্ত্তমান পৃথিবীকে বলব।

পূর্ণিয়া জেলার কাটিহার একটি প্রসিদ্ধ স্থান, গঠন নৈপুণ্যে, কর্ম্মচাঞ্চল্য মুখরতায়, আধুনিক পৃথিবীর আবহাওয়ায়, রেল কর্ত্তৃপক্ষের কৃপায় কাটিহার তার জেলার তুলনায় স্বর্গ, আমার নিজের অভিমত বহুস্থানে প্রকাশ করে বলেছি যে পূর্ণিয়া সদর থেকে যেদিন সন্ধ্যায় তার সদরত্ব সরকার তুলে নেবে তার পরদিন দ্বিপ্রহরে পূর্ণিয়ার রাজপথে শৃগাল বিচরণ করবে।

কাটিহার থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে সুখাসন নামে একটি গ্রাম আছে, গ্রামটি সুবৃহৎ, তার জমিদার হিন্দু কিন্তু প্রজা শতকরা নব্বই জন

মুসলমান ; এই শ্রেণীর মুসলমানের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। তাদের প্রচলিত নাম 'শেরশাবাদি' মুসলমান, তারা সাধারণতঃ বাংলার মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা থেকে বাস তুলে এসে বিহারে প্রধানতঃ পূর্ণিয়া জেলায় নূতন বাসস্থান বহুদিন পূর্ব্বে গড়ে তুলেছে, যেখানে একঘর প্রথমে এসেছিল ক্রমে ক্রমে সেখানে তারা সুবৃহৎ গ্রাম গড়ে তুলেছে, গভীর ঘন জঙ্গল কেটে, শতাব্দী-পতিত জমিতে সোনার মত ফসল উৎপাদন করে' ; এদিকে প্রবাদ আছে যে তাদের তুল্য চাষী বিরল ; সেটা তাদের বালুকা-বিস্তীর্ণ জমির বুকে ফসলের ঢেউ দেখলে অনুমান করা যায়। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী লোকে বলে তারা নাকি নবাব শেরশার আমলে বাংলা ও বিহারের সংযমস্থলে সুদূর প্রদেশ থেকে এসে ঘাঁটি করে এবং সেই থেকেই তারা 'শেরশাবাদি' মুসলমান নামে খ্যাত ; অবশ্য এ নাম সম্পর্কে অন্য তথ্যও প্রচলিত আছে, যাই থাক, ঐতিহাসিক মূলতত্ত্ব আমার কাহিনীর প্রতিপাদ্য নয়, প্রথম তথ্যটাই আমার ভাল লেগেছে। এরা পরিশ্রমী, এদের মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষাও পরিশ্রমী, এরা সরল, বিশ্বাসী এবং পরিচ্ছন্ন ; তাদের একমাত্র দোষ যে তারা ভয়ানক রাগী এবং অতি সামান্য ব্যাপারে তারা মারামারি ক'রে রক্তাক্ত কলেবরে এসে মামলা করে এবং সামান্য হেতুর জন্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পুনরায় অপর পক্ষের সঙ্গে কোলাকুলি করে। আমার বিশ্বাস পূর্ণিয়ার উকিল-মোক্তারের পকেটে অধিকাংশ পয়সা তারাই দেয়।

সুখাসনের অধিকাংশ মুসলমানই বাবার মক্কেল, উত্তরাধিকারসূত্রে আমি তাদেরকে করায়ত্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি ; সুখাসনের মুসলমানদের প্রধান ব্যক্তির নাম সুলেমান, সে গ্রামের মণ্ডল, অর্থাৎ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাকে প্রধান বলে মান্য করে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিপদক্ষেপে

তার পরামর্শ ও আদেশ শিরোধার্য্য ! সুতরাং তার নাম সুলেমান মণ্ডল
বছর পঞ্চাশ বয়েস, তেলে পাকান বাঁশের লাঠির মত চেহারা, চো
মুখে কাঠিন্য ও সরলতার মিশ্র আবহাওয়া, সুলেমান মণ্ডলের চেহা
আমি আকৈশোর একই প্রকারের দেখছি। বাড়ীতে অতি পুরাতন ভৃ
যেমন শেষে তার পুরাতন প্রভূকেও শাসন করবার প্রয়াস পায় সুলেমান
তেমনি এখন বাবাকে সেই শ্রেণীভূক্ত করবার চেষ্টা করে ; আমা
সে শিশু দেখেছে, কিশোর দেখেছে, এখন যুবক উকিল দেখছে, সুতর
সুলেমান এখনও আমাকে 'তুমি' এবং 'খোকা' বলে, অথচ এই অশিক্ষি
লোকটির কথাবার্ত্তার মাঝে কোন অপরিচিত বা গণ্যমান্য ব্যা
এসে উপস্থিত হলে, সুলেমান তৎক্ষণাৎ 'উকিলবাবু' এবং 'আপনি' ব
সমানে কথা চালিয়ে গিয়েছে ; আমাকে যেন সুলেমান রীতিমত
করত, শাসন করত, প্রয়োজন হ'লে সুলেমানের অভিমান দেখেও আ
আশ্চর্য্য হয়েছি।

আমাদের বাড়ীর সঙ্গে তার পরিচয় কত স্মৃতি বিজড়িত।

সুখাসনের জমিদারও বাবার মক্কেল ; তিনি বয়সে তরুণ, নাম শান্তশ
চৌধুরী ; বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ধাপেও পদার্পণ না করে' তাঁর সুশি
তাঁর মার্জ্জিত অমায়িক ব্যবহার দ্রষ্টব্য। তাঁরা অতি পুরাতন বনে
বংশ, কয়েক পুরুষের জমিদারী তাঁদের, তাই পুরাতন মর্য্যাদাসম্প
জমিদার বংশের আভিজাত্য আছে, ব্যবহার আছে, এবং বাংলার বনে
বংশের মত মাত্র নামটুকু আঁকড়ে ধরে ক্রম বিলীয়মান সম্পদের দি
করুণ দৃষ্টিতে না তাকিয়ে বিহারের জমিদারের মত বংশের ধাপে ধা
বৎসরের ধাপে ধাপে সম্পদের ক্রমোন্নত স্তরের দিকে দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকি
আছেন। পূর্ণিয়ার বহু স্থানে তাঁর ভূসম্পত্তি বিস্তীর্ণ, কিন্তু সপরিবা

থাকেন সুখাসন থেকে সাত আঠ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম ভবানীপুরে, সুখাসনে তাঁর কাছারী আছে, সুন্দর সুরম্য স্থানে ; বিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রতি এলাকার কছারীতে মাসে একবার পদার্পণ করে' নিজে তত্ত্বাবধান করার নিয়ম তিনি তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন ; বিহারের অধিকাংশ জমিদার বংশের এইরূপই নিয়ম। কলকাতায় রেস্ ও রামবাগান দূরে থাক তাঁরা নিকটবর্ত্তী সহরেও খুবই কম আসেন কিংবা থাকেন। সুতরাং তাঁদের জমিদারী আছে ; তারা শুধু জমিদার নয়।

শান্তশরণবাবুর পিতা মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও বাবার মক্কেল ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর শান্তশরণবাবু বাবার মক্কেল হন, নিজের পিতার বয়েসী বলে' তিনি আমার বাবাকে পিতার মতই ভক্তি করেন, আমি দেখেছি তিনি আমার বাবা ও মাকে পদস্পর্শ করে' প্রণাম করেন।

শান্তশরণবাবু হয়ত আমারই বয়েসী হবে, কিংবা দু-এক বছরের বড় ; আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ছোটখাট ছুটিতে কিংবা স্থবিরতার চরম সীমায় পৌঁছলে, গতির জন্য যখন দেহের সমস্ত শিরাপ্রশিরা উন্মত্ত হ'য়ে উঠত তখন মাঝে শান্তশরণের কাছাড়ী বাড়ীতে দু-একদিন বিশ্রাম করে' জানবার চেষ্টা করতাম যে জীবিত আছি, বুঝবার চেষ্টা করতাম যে মানুষ হ'য়ে জন্ম নিয়েছিলাম—চেষ্টা করলে উকিলের চেয়েও বড় কিছু হ'তে পারতাম, যাতে পয়সা না থাকলেও জীবন ছিল। শান্তশরণের আতিথেয়তা ও যত্ন উদাহরণ যোগ্য!

গত জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে কিসের জন্য যেন দুদিনের ছুটি ছিল, পূর্ণিয়ার শীত ও পূর্ণিয়ার প্রাণহীনতায় সারা দেহ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পৈতৃক চালু প্রাণটাই যেন ভিতরে বলে উঠছিল "আর পারিনে, এবার আমিও বন্ধ হব বাপু। তোমাকে দিয়ে আমার আর পোষাল না—!" চমকে উঠলাম,

এখন যে অনেক আশা অপূর্ণ, বহু কাজ করব বলে ভেবে রেখেছি। সে
সঙ্গে জমিদার বন্ধুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর এল 'স্বাগতম, এখানে পা
এসেছে বন্ধু, আসবার সময় বন্দুকটাও নিয়ে এস—!' ছুটির পূর্ব্বদিনে
অন্তরঙ্গ দুজন বন্ধুকে সাথী করে যাত্রা করলাম। পূর্ব্বের অভিযানে
তারা সাথী ছিল, পথঘাট পদ্ধতি সব তাদের সুবিদিত।
শীতের একটা মাদকতা আছে, তার প্রাণ আছে, বিশেষ পূর্ণিয়ার শীতে
তুহিন-শুভ্র হিমাচলের পাদদেশে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই শে
জেলায় শীতকালের আবহাওয়া অপূর্ব্ব, এখানকার এই একটি মা
জিনিস যা আমাকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে। আমার বা
থেকে ষ্টেশন প্রায় চার মাইল; অর্থাৎ শহর থেকেও এই ব্যবধান, পূর্ণিয়া
অদ্ভুত ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেশনে যাতায়াত করতে হয়, লোকে বলে এম
অদ্ভুত এবং কষ্টকর যান সমগ্র বিহারে আর কোথাও নাই, আমি ব
সমগ্র পৃথিবীতেও নাই। বেলা বারটার সময় বারবেলা মাথায় করে
তিন বন্ধুতে বাড়ী থেকে ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, বারটা স্মর
নাই, বেলাটা আছে, যাত্রা শুভ হয়েছিল কী অশুভ হয়েছিল তা যাত্রা
ঈশ্বরই জানেন। যখন গাড়ীতে উঠলাম তখন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছিল
চতুর্দিকের কুয়াসা তখনও ভালভাবে বিলীন হয়নি শেষ রাত্রের বৃ
তখনও একই ছন্দে পড়ছিল ; এ সময়টায় পূর্ণিয়ায় এরকম আবহাও
একবার হয়, ক্রমান্বয়ে সাতদিন থাকে, উপহার দিয়ে যায় প্রবল শীতে
প্রবলতর করে' ; যাত্রার পূর্ব্বে মা একবার খুবই দুর্ব্বল সুরে বলেছিলে
"হ্যাঁরে, এই দুর্য্যোগে যাবি ? দু'দিন পরে গেলে হয় না ?" বা
বললেন—"থাক্‌না, এখানে বসে বসে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওটে, দুদিন ছুটি আ
একটু ঘুরে আসুক। শান্তশরণ দুঃখিত হবে—এই ত বাড়ীর কাছে।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল।

ষ্টেশনের কাছে এসে শেষ মোড়টা ঘুরতে গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে প্রাণটা চমকে উঠল।

"এই, গাড়ীটা একটু থামাত।" আমার আদেশে গাড়ী থামলে বন্ধুদের গল্পে বিরতি পড়ল, তারা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হ'য়ে আমার দিকে তাকাল।

"কী ব্যাপার? মাঝপথে গাড়ী থামালে ট্রেণ ফেল হব, ষ্টেশনে গিয়ে কবিত্ব করিস।" বন্ধুরা গল্পে পৃথিবী ভুলে ছিলেন, সারাটা পথ কথার স্রোতে উজান টেনে আসছিল, আমি সে উজানে নদীর ধারের বক্র দীর্ঘ তালগাছটির মত শুধু নদীর বুকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখবার চেষ্টা করেছি।

"না কিছু করব না। দেখত ঐ লোকটা মরে গেছে নাকি?" আমার নির্দ্দেশকে অনুসরণ করে তারাও অদূরে রাজপথের ধারে একটি স্থানে নিজের দৃষ্টিকে আবদ্ধ করল—"তাই ত! মরাই ত মনে হচ্ছে রে? এই গাড়োয়ান, উঁহা উঠো ক্যা মুর্দা হ্যায়?"

"জীহাঁ, কাল ভোর্‌মে উ আদমী এঁহা মর গিয়া; হায়জামে মরা হোগা মালুম, কয়েক দফে রদ্ কিয়া থা বাবু।"

পূর্ণিয়ার এই পথটি সহরের প্রধান পথ ও প্রশস্ত পথ, কাড়াগোলা থেকে সোজা দার্জ্জিলিং গিয়েছে বলে পথটির নাম দার্জ্জিলিং রোড, এই জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য অনেক বেশী। সুদীর্ঘ পথের দুধারে বৃহৎ গাছের শ্রেণী পথিককে শতাব্দী থেকে ছায়া দান করে' পথের নির্দ্দেশ দিয়ে আসছে।

এই পথের শেষ কিনারায় শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত বৃদ্ধ বট গাছের তলে একটি মৃতদেহ;

পথের দিকে মাথা দিয়ে দেহটি বেঁকে পড়ে আছে, চোখ দুটি ঊর্দ্ধে নিবদ্ধ, অনন্তে তখনও কী যেন অন্বেষণ করছিল, একখানা হাত বুকে ওপর আর একখানা এলায়িত হ'য়ে পথের উপর পড়ে' আছে, সে হাত মুষ্টিবদ্ধ নয়, দক্ষিণ হস্তে তখনও লোকটা কী যেন প্রার্থনা করছিল; সমস্ত দেহটার ওপর সহস্র মাছি বসেছে, উন্মুক্ত মুখগহ্বরে তারা নির্ব্বিবাদে যাতায়াত করছে; দেহের আবরণের মধ্যে কটীদেশে ছিল জীর্ণবাস, তাছাড়া সমস্ত দেহই নগ্ন; দেহের অদূরে জীর্ণতম একটি পাত্র পড়ে', পাত্রের অবস্থা ও বর্ণ দেখে তার ধাতু নির্ণয় করা প্রাগেতিহাসের ঐতিহাসিকের পক্ষেও দুরূহ। পূর্ব্বদিনের রৌদ্র ও বৃষ্টিতে দেহটাকে বিকৃত করে নাই, জীর্ণ শীর্ণ দেহটি বহুক্ষণ দেখে অনুমান করলাম যে লোকটির বয়েস বছর ষাটেক হয়েছিল।

"বেচারা—।" আমার মুখ দিয়ে একটি মাত্র শব্দ আত্মপ্রকাশ করল অতক্ষণ আভ্যন্তরিক আলোড়ণের পর।

"এই আদমীঠো বাঙ্গালী থা বাবু—।"

"বাঙ্গালী—।" আমি যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলাম; এই সুদূর দেশে বাঙ্গালীর এই পরিণতি।

"আরে বাঙ্গালী আর ইংরেজ কী, সব মানুষেরই মৃত্যু অনি[illegible]।" বন্ধু কুমার মত প্রকাশ করলেন; পৃথিবীর পুরাতনতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি, কিন্তু তাই বলে এই রকম মৃত্যু? মৃত্যুর পর এক ফোটা চোখের জল ফেলবার কেহ থাকে না, এমন মৃত্যু মহাশত্রুরও যেন না হয়। আমার অজ্ঞাতেই যেন চোখের কোণে জল চলে এল। মৃতদেহর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম "তুমি কে জানিনে, যে কোন জাতিই হও, মানুষের জন্য

মানুষ ভাইএর শেষ অর্ঘ্য গ্রহণ করো। তোমার আত্মা যেন শান্তি পায়।”
ঘোড়ার পিঠে আবার চাবুক পড়ল।

পূর্ণিয়া থেকে কাঁটিহার রেলে প্রায় এক ঘণ্টার পথ, যথা সময়ে কাটিহারে এসে পৌঁছলাম, বেলা তখন প্রায় দেড়টা ; ষ্টেশনে পরিচিত দোকানে চা পান করে' শীতের জড়তা, পথের দৃশ্য দেখে স্তিমিত প্রাণটাকে সতেজ করবার চেষ্টা করলাম, মনে মনে বন্ধুর মত বলবার চেষ্টা করলাম —“মৃত্যু ? ওটা অতীব সামান্য, মানুষ কেন জীবমাত্রেরই এই পরিণাম অনিবার্য্য।” এ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ভিতরেই বলল—“কিন্তু তাই বলে এরকম মৃত্যু ?” “আরে ছি। মৃত্যুর আবার রকমফের কী ? শূন্যের আবার ছোট বড় কী ?” পুনরায় প্রত্যুত্তর পেলাম।
মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠল।

সুখাসন অভিমুখে শান্তশরণের প্রেরিত গরুর সম্পানীতে চড়লাম। পূর্ব্বে যতবার গিয়েছিলাম পূর্ণিয়া থেকে সুখাসন পর্য্যন্ত মটরেই গিয়েছিলাম, কিন্তু এ সময় সেটা কল্পনাতীত, সুতরাং এই ব্যবস্থা। কাটিহারে ক্ষণিক বিশ্রাম করে', কিছু জিনিস পত্র কিনে আমরা যখন সম্পানীতে চড়লাম বেলা প্রায় চারটা। কাটিহার থেকে সুখাসন পর্য্যন্ত যে পথ সেটা কাঁচা কিন্তু ভাল। গৃহাভিমুখী গাভী ও গোপাল, ঘর্ম্ম ক্লান্ত উল্লসিত কৃষকের সাথে, ঊর্দ্ধে বলাকার শ্রেণীর ছন্দের নীচে, চতুর্দ্দিকে গোধূলির আলিঙ্গন স্পর্শ নিয়ে আমরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছুটে চললাম—সম্মুখের পশ্চিমের মৃতপ্রায় সূর্য্য বার বার সেই মৃতের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। “পৃথিবীর প্রাণের যদি এই দশা তবে জীব লোকের এত দুঃখ কিসের ?” আমি কিছু চিন্তিত হলাম। “কিছু কাল পরে যে আবার এঁর পুনরাবির্ভাব হবে।” আমি যেন উত্তর দেবার

চেষ্টা করলাম। "জীবের প্রাণেরও একই দশা—" আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

আমি অন্য কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলাম না।

সুখাসন গ্রামের প্রান্তে যখন পৌঁছলাম সূর্য্য তখন অস্তগত কিন্তু তার রেশটুকু তখনও সমগ্র পৃথিবীকে নেশার শেষ রেশের মত মধুর করে রেখেছে। গ্রামে ঢুকতেই দেখি সুলেমান মণ্ডল কয়েকজন লোক নিয়ে আমাদের পথ রুদ্ধ করে দাড়িয়ে।

গাড়ী থামল।

"কী মণ্ডল সাহেব, আমাদের গাড়ী! ডাকাতি করবার মতলবে ছিলে নাকি? কিন্তু এখনও যে সন্ধ্যে লাগেনি।" আমি বললাম।

সুলেমান নত হ'য়ে দীর্ঘ সেলাম করল। "সুলেমান ডাকাতি করলে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে করে না; খবর পেলাম আপনি আসছেন তাই, এ গরীবের গরীবখানায় পদার্পণ না করে রাজার বাড়ীও যাওয়া হবে না।"

"নিশ্চয়ই সুলেমান তোমার বাড়ী নিশ্চয়ই যাব। একী তোমাকে বলতে হবে; চলরে গাড়োয়ান।" সুলেমানের আদেশ অমান্য করে সে সাহস জমিদারের সামান্য গোশকট চালকের নাই। আমার এ ব্যবস্থায় বন্ধুরা বিশেষ প্রীত হলেন বলে তাদের মুখের আবহাওয়ায় মনে হল না। সম্মুখের নিশ্চিত রঙ্গিন উদ্দেশ্যকে ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে মোড় ফিরতে কেউই স্বীকার করে না;

"এই ত তোর দোষ! শুভ কাজে দিলি একটা বাধা।"

"ভয় নাই বন্ধু, এখানে বেশী দেরী করব না, লোকটার এতখানি আশা উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওর কথা কাটবার ক্ষমতা স্বয়ং জমিদার শান্তশরণের ও নাই।"

"আরে এটা বুঝালে না ব্যবসার চাল।" কুমার আমাকে বলল নাথকে উদ্দেশ ক'রে। আমি কোন উত্তর দিলাম না, মানুষের অনুভূতির সঙ্গে বাস্তবের তুলনা করা এতখানি স্থূল যে সেসব ক্ষেত্রে নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করি।

সামান্য দূরে সুলেমানের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম।

নাতিক্ষুদ্রগ্রামখানি শীতের রাত্রে স্তিমিত হয়, কিন্তু তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা, গ্রামখানি তখনও মৌচাকের মত সজীব ছিল, গরু এবং মানুষ কিছু পূর্ব্বেই ঘরে ফিরেছে সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, গরু তার খুটিতে এবং মানুষ তার ক্ষুদ্র আশ্রয়ে রাত্রের ব্যবস্থা করছিল, ঘরে ঘরে স্নিগ্ধ তৈল প্রদীপ উর্দ্ধের আকাশের স্নিগ্ধতর তারাকে ইঙ্গিত করছিল ছিন্ন ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মেঘের অন্তরাল থেকে আত্ম প্রকাশ করে' অন্দরে ও অন্তরে উঁকি দিতে; দূরের মাঠের উপর দিয়ে তরল আবরণ গ্রামের বধূর লজ্জা নিবারণ করে' রাত্রের মধুরিমার লজ্জা নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। গ্রামখানিতে শুধু মুসলমানের বাস, সারা গ্রামে একমাত্র সুলেমানেরই টিনের বাড়ী সকলের বাড়ীর উপরে মাথা তুলে আছে।

সুলেমান তার বাংলা ঘরে আমাদের অভ্যর্থনা করল; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে চৌকির উপর মূল্যবান জড়ির কারুকার্য্য করা ফরাস পেতে সে রাজসিক অভ্যর্থনা আজও আমার মনে আছে, মুহূর্ত্তে একটি ডে-লাইট জ্বালিয়ে ঘরে টাঙ্গিয়ে দিল। সম্মুখে তাকিয়ে দেখি জন সমুদ্র, বালক বৃদ্ধ ও যুবক উৎসুক সম্ভ্রম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আমাদের দৃষ্টি তাদের উপর পড়তেই ক্রমান্বয়ে সকলে সেলাম করতে আরম্ভ করল, প্রথম দিকে প্রত্যুত্তর দিয়ে পরে হতাশ হ'য়ে বন্ধ করলাম। সুলেমান ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। সুলেমান গ্রামের

ধনী ও প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার পরিয়ে করিয়ে দিল রীতিমত বিলাতি প্রথায়, তারা পুনরায় দীর্ঘ সেলাম করে কৃতার্থ মুখে এক পাশে বসল। কিছুক্ষণ পরই একটি গ্রামোফন ও প্রচুর রেকর্ড এল, সুলেমানের আদেশে একজন যুবক ক্রমাগত পুরাতন বিশ্রীগান বাজিয়ে চলল।

"এবার ওটা বন্ধ করতে বল্ বাপু।" কতক্ষণ পরে নাথ আমার কানে কানে বলল।

"আহা বেচারা দুঃখ পাবে, এর ভিতরে কতখানি হৃদয় আছে ভেবে দেখ, এর চেয়ে বড় অভ্যর্থনা ও আর ভেবে পাচ্ছে না।" আমি বললাম।

"সুতরাং বসে বসে এই গজল গুলো শুনতে হবে? এর চেয়ে আত্মহত্যা কম যন্ত্রনাদায়ক ছিল বোধ হয়।" বন্ধু উত্তর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ পর সম্মুখে পরিষ্কার মূল্যবান দস্তানা পেতে সুলেমান আহার্য্য দিল, চায়ের সেট, গরম ডিম সিদ্ধ এবং আরও দুতিনটা কী খাদ্য যেন।

"এত কেন করলে সুলেমান, রাত্রে তোমার জমিদার কাছারীতে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে—এত ত খাওয়া যাবে না।" আমি বললাম।

"গরীবের বাড়ীতে কী আর আছে বাবু, জমিদারের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি না, আমার বাড়ী আজ ধন্য হয়েছে।"

"তোমার সঙ্গে কথায় পারব না, চা আর ডিম খাচ্ছি, ও গুলো তুমি তুমি সরিয়ে নাও, রাত্রে বরং কিছু মুর্গীর মাংস রেঁধে কাছারীতে পাঠিয়ে দিও—ওখানে ওটাত আর হবে না, আমাদের জমবে ভাল;"

"সে কী আপনার বলার অপেক্ষায় আছি বাবু, আমি অন্দরে বলে দিয়েছি—"

বন্ধুরা যে ভাবে ডিম ও চা খেলেন তাতে অনুমান করলাম যে ভবিষ্যতে সুলেমানের বাড়ী না এসে তারা স্বর্গে যেতে প্রস্তুত হবেন না।

পান ও সিগারেট এল অবশেষে ;

"এবার আমরা উঠি সুলেমান, গাড়ীটা তৈরী করতে বল।"

"বাবু, বিবি আয়েষা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়—"

"ওঃ আচ্ছা চল—"

বিবি আয়েষা আমার সঙ্গে দেখা করে সেলাম করে নিজের কুশল জানাল, বিদায় নেবার সময় আমাকে একখানা কাঁথা উপহার দিল। কাঁথার ও আয়েষার সামান্য কাহিনী আছে। আয়েষা কিছুদিন পূর্ব্বে তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে সুলেমানের শরণাপন্ন হয়ে আমার কাছে যায় ; আয়েষা যুবতী এবং পরমাসুন্দরী, তার সৌন্দর্য্যের জন্য সে পূর্ব্বে যে কোন বাদশার স্ত্রী হ'তে পারত, গোলাপ জলে অলক্তকরঞ্জিত পদযুগল রেখে, অগুরু ধূপে এলায়িত কেশরাশি শুষ্ক করতে করতে ভারতেশ্বরের দরবার দেখতে পারত। অদূরের একটি গ্রামের একজন ধনী আট বৎসর পূর্ব্বে বহু অর্থ ব্যয় করে' আয়েষার দরিদ্র পিতাকে ষাট বিঘা জমি দিয়ে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করে, অপর্য্যাপ্ত আদরে রেখে একটি কন্যা তাকে উপহার দিয়ে তার স্বামী কয়েক মাস পূর্ব্বে ষাট বৎসর বয়েসে তৃতীয়বার বিবাহ করে এবং আয়েষার উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়, পিতার জমি পুনরায় সে কেড়ে নেয়।

আয়েষা বিচারালয়ের শরণাপন্ন হয়।

বিচারে আয়েষা তার স্বামীর কাছ থেকে মাসিক সাত টাকা খোরপোষ এবং পৃথক থাকবার অনুমতি পায়। তখন আয়েষা আমাকে একখানা কাঁথা দেবে বলেছিল, কথাটা আমি ভুলে গেলেও সে ভুলে নাই ; আজ সেই উপহার। সামান্য কাপড়ের ওপর পাড়ের সূতা দিয়ে যে সূক্ষ্ম

সূচীকার্য্য সে করেছে তা শুধু অপূর্ব্ব নয়, অদ্ভুত। রংএর সুন্দর সন্নিবেশে সে খানা দূর থেকে মূল্যবান শাল বলে ভুল হয়।

"আয়েষা আবার নিকে কর,—" আমি তাকে বললাম।

"মেয়েটার বয়েস সাত বছর হল বাবু, আর সময় নেই। ওটাকে মানুষ করব ভাবছি—" আয়েষার উত্তর শুনে স্তম্ভিত হলাম।

কাঁথাখানা আজও আমার কাছে আছে। আয়েষা আজও নিকা করেনি।

যথা সময়ে জমিদারের কাছারীতে পৌঁছলাম, সুলেমান সঙ্গে এসেছিল। শান্তশরণের অভ্যর্থনার পুনরুল্লেখ করে আমার কাহিনীর স্রোতকে বাধা দিতে চাই না।

কাছারীর একটি সুসজ্জিত ঘরে আমরা শিকড় ফেললাম, সুলেমানের বাড়ী থেকে মাংস এবং পোলাও এল, শান্তশরণের কাছারীর আহার্য্যও এল; ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে সুলেমান বিদায় নিল। পরিচিত পুরাতন ভৃত্য এসে আমাদের তিনজনের জন্য হুইস্কি এবং সোডা পর্য্যাপ্ত রেখে দিল সম্মুখে।

আমাদের পান ও আহার হল।

"এবার তোমাদের আনিয়ে দি—রাত হয়েছে।" শান্তশরণ আমাকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ ভাই শেষ দৃশ্যের যবনিকাটা তুলে তুমি বিশ্রাম করো গিয়ে, সকালে একবার খবর নিও—" আমি হেসে বললাম।

"সে ত নিশ্চয়ই, রাত্রেও আমার হুকুম আছে তোমাদের ঘরের সম্মুখেই দারোয়ান থাকবে—খবরদারি সারারাতই চলবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই [illegible] উপস্থিত হল, শান্তশরণ সে ঘর থেকে বিদায় নিল, আমি উঠে ঘরের দ্বার বন্ধ করে দিলাম।

তারপর সে ঘরের কাহিনী আপনার জন্য নয়, আমার একান্ত নিজের সুতরাং ক্ষমা করবেন, কোন প্রকার ঔৎসুক্য দেখালেও বলতে পারব না। মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতরে আমরা সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। কতক্ষণ পরে বলতে পারি না আমি ধীরে ধীরে দুয়ার খুলে বাইরে এলাম, উপরের বিক্ষিপ্ত মেঘ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে জ্যোৎস্নার আলোতে সমগ্র পৃথিবী এলিয়ে আছে, শীতের তরল কুয়াসাবরণ যুবতী পৃথিবীর নগ্নদেহ আবৃত ক'রে তার রূপের ছটা চতুর্দ্দিককে স্তব্ধ করে রেখেছে, দূরে দূরে গ্রাম গুলো অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠেছে; গ্রামের পথ ধরে, মাঠের পথ ধরে, নদীর পার দিয়ে আমবাগান বাঁশঝাড়ের নীচ দিয়ে আমি এগিয়ে চল্লাম, বহুক্ষণে বহুদূরে আমি একটি বাঙ্গালী হিন্দু গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে সুষুপ্ত একটি বাড়ীর দ্বারে মৃদু টোকা দিলাম।

কে—?

"আমি—দরজা খোল।" দ্বার খুলে অপরিচিত মুখ আমাকে দেখে ক্ষণিক বিস্মিত হ'য়ে পর মুহূর্ত্তেই বলল।

"ও! তুমি! এস!"

"এত রাত্রে বাড়ীতে এ চাঞ্চল্য কিসের গো?" আমার বিস্মিত প্রশ্ন!

"ওঃ, আজ আমার বড় আনন্দের দিন গো বাবু—আমার একমাত্র ছেলের বৌ'র প্রসব ব্যথা উঠেছে—আমার নাতি হবে গো—নাতি!" বৃদ্ধের সে হাসি আজও আমার মনে আছে।

জন্ম

আমার উপস্থিতির কিছুক্ষণ পরই নারীর প্রসব বেদনার কাতরোক্তিকে ছাপিয়ে সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দন এই সুন্দর পৃথিবীতে নবাগতের আগমন বার্তা ঘোষণা করল; নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পৃথিবীতে ঈশ্বর জন্ম গ্রহণ করলেন, আমি যুক্ত করে তাঁর আগমনকে প্রণাম করে অভ্যর্থনা করলাম। বাড়ীর অন্দর থেকে সাতবার শঙ্খধ্বনি হল ও সাতবার উলু দিল মেয়েরা।

"ওগো আমার নাতি হয়েছে গো—ওগো ঠাকুর আমার নাতি হয়েছে, আমার বংশের প্রদীপ জ্বলল!" বৃদ্ধ একবার শূন্যে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করে আমার পদতলে আর একবার প্রণাম করল; বৃদ্ধ আমার পিতায় বয়েসী, তখনও তার জাত জানতে না পারলেও বয়েসের মর্য্যাদার জন্য প্রণাম করা উচিত হয় নাই জানি কিন্তু তার সে আনন্দের প্রণাম আমি মনে মনে আনন্দময়ের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করে দিলাম।

"চল আমার নাতি দেখবে চল, তুমি কে জানিনা, তোমার পদধূলিতেই আজ আমার বৌমার সুপ্রসব হল, চল তুমি সর্ব্বপ্রথম তার মুখ দেখবে, তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে সে পৃথিবীর যাত্রা আরম্ভ করুক, তুমি দেবতা তুমি আজ আসবে জানতাম—চল ঠাকুর—"

"আমি সামান্য মানুষ, আমার আশীর্ব্বাদ—?"

"সামান্য মানুষ? হতেই পারে না! ও সব চালাকি আমি অনেক পড়েছি, তোমাকে ছেড়ে গেলে তুমি পালাবে ঠাকুর। চল—" আমাকে

দ্বিতীয়বার বাধা দেবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে।

দুজনে গিয়ে আঙ্গিনায় একখানা কুড়ে ঘরের সম্মুখে দাঁড়ালাম, বুঝলাম সেখানাই আতুড়ঘর, তার ভিতর থেকে শিশুর ক্রন্দন শোনা যাচ্ছিল, ঘরের সম্মুখে মেয়েদের বেশ ভিড়, সে ভিড়ে কিশোরী থেকে বৃদ্ধা সকল বয়েস ও শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিল। অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়সী যারা তারা নিজেদের আদেশ ও অনুমতি দিয়ে, সে সময়ের যথাকর্ত্তব্য বিধি ও নীতি প্রয়োগ করবার আদেশ ও আয়োজন নিয়ে আতুড়ঘরের দাইকে রীতিমত ব্যস্ত করে তুলছিল। জন্ম, বিবাহ কিংবা মৃত্যুতেও প্রধান জিনিসটির চেয়ে তার আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলির মূল্য পল্লীগ্রামে অধিকতর, মূল বাদ দিয়ে তখন সুদ নিয়ে টানাটানি পড়ে, বিবাহে যে স্ত্রীআচার রীতিমত অত্যাচার সেটা হয়ত কোন বিবাহিতকে দ্বিতীয়বার বলতে হবে না, তখন বর নেশায় থাকে বলে সে অত্যাচারগুলো মধুর লাগে অন্য সময়ে সুস্থ লোককে পাগল করতে তার দুচারটিই যথেষ্ট, জন্মেও ঠিক সে গুলোর মত সহস্র অনুষ্ঠান আছে, এমনকি মৃত্যুতেও অনুষ্ঠানের জন্য সদ্য স্বামীহারা স্ত্রী কাঁদার অবসর পায় স্বামীর শ্রাদ্ধের পর।

ঘরের বাইরে দেখলাম কয়েকজন নারী ছুটাছুটি করে নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির সুসমাপন করার চেষ্টা করছে!

"আরে একটু মধু আন শিগ্‌গির — মধু দিয়ে ছেলের মুখের 'রা' ভাঙ্গতে হয় যে—আঃ তোমরা যেন বিলেত থেকে এলে গো! জনৈক বৃদ্ধা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"এখন নয়গো এখন নয়। আগে ফুলটা পড়ুক, ফুল না পড়লে

ছেলের 'ভূমিষ্টি'ই হল না — সব যেন নতুন এলে বাংলা দেশে" আর একজন মন্তব্য করলেন।

"না গো না — ভূমি ছুঁলেই ভূমিষ্টি হল, ছেলে কাঁদবার আগেই মধু দেওয়া উচিত ছিল—বরং দেরী হয়ে গেছে। কইগো বাড়ীর গিন্নি গেল কোথা? এই যে তুমি দাও নাতির মুখে মধু— তবে না ঠাকুমাকে মধুর মত দেখবে। কই যাও ঢুকে পড় আতুড়ে—"

"আমার দিদি মাদুলি আছে যে! আতুড় যেতে পারব না ত— তা না হ'লে কী এতক্ষণ বসে থাকি বাইরে ঐ চাঁদ মুখ না দেখে।"

"আ মলো যা। মাদুলি খুলে ঢোক না। রাজ্যিশুদ্ধু লোক যা করছে—দাও খুলে আমার বৌমার হাতে—আজ শুদ্ধু আছে, ধরত বৌমা ওর মাদুলিটা, প'রে ফেল না যেন তুমি, হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে একটু সরে দাড়াও, দেখ ছোঁয়াছুত না হয় যেন। যাও দিদি এবার যাও—বেরিয়ে এসে চান করে আবার ধারণ করো, নাতির মুখে মধু দিয়ে বলো সারা পৃথিমী তোমাকে মধুর মত দেখুক, আমার মাথার যত চুল তত বছর তোমার পেরমায়ু হোক—"

ঠাকুমা মধু নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে' শিশুর মুখে মধু দিয়ে মন্ত্রের মত প্রার্থনাটি বলে গেলেন।

"এই যে কর্ত্তা এসেছে, — ওগো আশীর্ব্বাদ করো নাতিকে, এখান থেকেই করো, ঘরে চাঁদ এসেছে গো, চাঁদ এসেছে—" জনৈকা বৃদ্ধা আমার সঙ্গে আগত বৃদ্ধকে বলেন।

"না, বৌঠান, আগে ইনি আশীর্ব্বাদ করবেন, আমার নাতিকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য আজ স্বয়ং দেবতা এসেছেন, এসো ঠাকুর এগিয়ে এসো—" দেবতার সঙ্গে বারম্বার আমাকে এক করবার জন্য বিশেষ

সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হলেও সরল-হৃদয় বৃদ্ধের মনে আঘাত দেবার কোন ইঙ্গিতই আমার মনে সেই দেবতার কাছ থেকে পাচ্ছিলাম না। বৃদ্ধের কথায় সকলের দৃষ্টি আমার উপর একত্রে পড়ল, অন্দরে অপরিচিত এক যুবককে দেখে সমবেত নারীর জনতায় যেন একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হল, কিশোরী ও যুবতীরা কিঞ্চিৎ দূরে সরে গিয়ে হয়ত আমাকে ভাল করে দেখবার সুবিধা করে নিল, সধবা প্রৌঢ়ারা তাদের মাথার কাপড় মাথায় তুলে নিলেন, বিধবারা নিজের অঙ্গের বস্ত্র কিঞ্চিৎ সংযত করে কিছু সরে দাঁড়ালেন, ফলে আমার সম্মুখের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাদের সমগ্র জনতায় আমার উপস্থিতি-সৃষ্ট চাঞ্চল্যটুকু বেশ অনুভব করতে পারলাম সেখানকার চাপা গুঞ্জনে।

"কইগো দাই, চাঁদকে একটু দরজার কাছে আন দেখি, চল ঠাকুর এগিয়ে চল।"

"দাড়াও গো, এখনও ফুল পড়েনি, এখন কেউ অন্য লোকে মুখ দেখতে পারবে না।" পূর্ব্বের বৃদ্ধা বল্লেন।

"কী যে বল বৌ'ঠান, এ হল অন্য লোক! স্বয়ং দেবতা, আমার রাধামাধব এসেছেন আজ। এসো ঠাকুর — দেখ বৌ'ঠান ইনি মুখ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ফুল পড়বে—"

"কী যে বল! পাচ সাত ঘণ্টার আগে দুনিয়ায় কারো পড়ল না —তেরটা ছেলে মেয়ে হল—"

"আচ্ছা দেখ, এস ঠাকুর।"

"থাকনা, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কিছুক্ষণ পরেই না হয় হবে, ততক্ষণ ভোরও হয়ে যাবে—" আমি এবার বাধা দিলাম।

"সে হয় না ঠাকুর এস —" বৃদ্ধ রীতিমত আমার হাত ধরে দ্বারের

সম্মুখে টেনে আনল। "কৈ গো গিন্নী—আর্ন দেখি ,আমার চাঁদকে একটু এদিকে—এই যে ঠাকুর তুমি আগে দেখ, আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম তুমি আগে দেখবে আশীর্ব্বাদ করবে তবে আমি—"

আমি প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে শিশুদেবতার মুখ দেখলাম, সুন্দর দীপ্ত মুখখানা, আশীর্ব্বাদ করতে ভুলে গেলাম, শুধু মনে মনে বললাম— "ঠাকুর তোমার ওপর বৃদ্ধের এত আস্থা, তুমি আমার ভিতর দিয়ে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করো—" ঠিক সেই সময়ে ভিতরে হর্ষধ্বনি শুনলাম, কে যেন বলে উঠল—" ওরে ফুল পড়েছে, উলু দে, উলু দে—"

উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা পুনরায় শেষ রাত্রের স্তব্ধ পৃথিবীকে জাগ্রত করলে তাদের হুলুধ্বনিতে। বাংলার পল্লীতে, ভারতের পল্লীতে এই মুহূর্ত্তটি প্রসূতির পক্ষে অতীব শুভ মুহূর্ত্ত, সহস্র সহস্র প্রসূতির মৃত্যুর মূল কথা এই অবস্থাটুকু।

"দেখলে — আমি বল্লাম।" বৃদ্ধ ক্ষিপ্রগতি আমাকে আর একবার প্রণাম করল, চক্রে পড়ে আমি তখন পাথরের দেবতা হয়ে গেছি।

জনতায় পুনরায় মৃদুগুঞ্জন শুনলাম।

কিছুক্ষণ পরই শিশু তার জীবনের প্রথম প্রভাত দেখল, অপূর্ব্ব প্রভাত!

প্রভাতের সাথে আমি পরিচয় পেলাম গ্রামের; তার অধিবাসীদের চুম্বক পরিচয়, আমি যার অতিথি হয়েছিলাম তার বিশদ পরিচয়।

গ্রামের নাম সোনাপুর, ভৌগলিক বৃত্তান্তে তার যথার্থ স্থান কোথায় তার কোন প্রয়োজন আমার কাহিনীর জন্য নাই। নামটি শুনে, গ্রামের বুকে পিঠে দূরে অদূরে তরঙ্গায়িত শস্য ক্ষেত্রদেখে, ঘরে ঘরে শস্যভাণ্ডার দেখে, দুয়ারে দুয়ারে ধানের বিচালির স্তূপ দেখে, সর্ব্বশেষে

প্রত্যেকটি পুরুষ মেয়ের মুখে হাসি দেখে আমি নামের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারলাম, সত্যই গ্রামটি সোনার পুরী। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু, দুচার দশ ঘর যারা মুসলমান ছিল তারা হিন্দুর সুখে দুঃখে উৎসবে এমন কী শ্মশানেও ভ্রাতৃতুল্য ছিল। গ্রামে সবশুদ্ধ একশ ঘর লোকের বাস।

সোনাপুর উত্তর দক্ষিণ লম্বা, সোনামুখী খরস্রোতা নদীর পশ্চিম পাড়ে সোনাপুর নদীর দীর্ঘ বাঁকের বুকে তৃতীয়ার চাঁদের মত সমুজ্জ্বল, পূর্ণিমার তীব্রতা নাই, অমবশ্যার পর তার বর্দ্ধিত স্নিগ্ধতা আছে।

আমি যে বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম এবার সে বাড়ীর পরিচয় প্রয়োজন। অন্দরে দুখানা শোবার খড়ের ঘর, বাংলাদেশের রীতিতে ঘর দুখানি চার চালায় অতীব সুন্দরভাবে নির্ম্মিত, অদূরেই বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা রাধামাধবের ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর মন্দির, এই মন্দিরটি গগনচুম্বী না হলেও পাকা, দুচালার একখানা রান্না-ঘর, একচালা একখানা ঢেঁকি ঘর, তিনটি শস্যের গোলা — এই হ'ল ভিতরের পরিচয়, বাইরে একখানা বৈঠক, দূরে গোয়াল এবং বৈঠকের পাশে একটি ছোট ফুলের বাগান হয়ত রাধামাধবের নিত্য পূজার স্থায়ী ব্যবস্থারই ঘোষণা করছে। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কিছু সুপারী ও নারিকেল গাছ, এখানে ওখানে কুমড়া লাউয়ের মাচা, ছোট ছোট ক্ষেতে শাক, লঙ্কা প্রভৃতি সোনাপুরে কেবলমাত্র এই বাড়ীরই বৈশিষ্ট্য নয়।

গৃহস্বামীর নাম রাধামাধব, গৃহের ও বংশের স্বামী মন্দিরস্থ পাষাণ দেবতা রাধামাধব। দেবতার জাত নাই কিন্তু বৃদ্ধ রাধামাধব জাতিতে কায়স্থ, বয়স প্রায় ষাটের কাছে—চারপুরুষের গৃহদেবতাও একমাত্র রাধামাধব এবং এই চার পুরুষ থেকে বংশেও একই সন্তান পুত্র হয়

এবং সেই পুত্রই পরবর্ত্তী বংশের গোড়াপত্তন একমাত্র সন্তান পুত্রে করে যায়। হয়ত বা এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্য এ সংসার সোনাপুর গ্রামের অন্দরে অন্দরে একটু চাপা কৌতূহল জাগায়, সকলের অন্তরে অন্তরে কিসের যেন আকর্ষণ আনে। ফলে ক্রমে ক্রমে রাধামাধবের মন্দির শুধু এই বাড়ীর নয়, সারা গ্রামের, এমন কী বহুদূর পর্য্যন্ত পাষাণ দেবতার জাগ্রত খ্যাতি আছে।

বৃদ্ধ রাধামাধব তার পিতার অধিক বয়সের সন্তান তার পুত্র কৃষ্ণদাসও তার অধিক বয়সের সন্তান এবং কৃষ্ণদাসেরও পরে অধিক বয়সে না হলেও প্রায় ত্রিশ বৎসরে সেদিন পুত্রসন্তান হল, যদিও সকলেরই বিবাহ কুড়ির পূর্ব্বেই হয়; কিংবদন্তী আছে যে সে গৃহে পুত্রবধূ দশবৎসর গৃহদেবতার পূজা না করলে জননী হবার সৌভাগ্য পায় না। সন্তান-ভাগ্য সুপ্রসন্ন করবার ক্ষমতাই নাকি জাগ্রত পাষাণ দেবতা রাধামাধবের অলৌকিক ক্ষমতা, যার জন্য অন্যান্য জেলা থেকেও মেয়েরা সোনাপুরে ভিড় করে। বৃদ্ধ রাধামাধব কিন্তু ঠাকুরের সে ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অর্থোপার্জ্জন করে না, অপূর্ব্ব ক্ষমতার জন্য ঠাকুরের কোন 'ফিস্‌' নাই, বৃদ্ধই সেটা হতে দেয় নাই, যার ফলে সে পেয়েছিল দেবতার আশীর্ব্বাদ, দুচার দশখানা গ্রামের আন্তরিক প্রীতি, সোনাপুরের ভালবাসা। শুধু বৃদ্ধের বারণ না শুনেও ভক্তেরা ঠাকুরকে একটি মন্দির গড়ে দিয়েছিল। গৃহস্বামীর নাম রাধামাধব দাশ।

আঙ্গিনার একপাশে ছোট্ট একখানা সদ্য নির্ম্মিত ঘরকে আতুড় ঘর করা হয়েছিল। প্রভাতে আমি তার চেহারা দেখলাম, গ্রাম্য রীতিতে সে ঘরখানাকে একপ্রকার কাঁটাবহুল লতা দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছে, ঘরের চালার এক কোনে গরুর মাথার একটি কঙ্কাল ঝুলিয়ে দেওয়া

হয়েছে—এবং অন্যান্য ছোট খাটো আনুষঙ্গিক প্রথাগুলো পালন করেছে। রাত্রে শিশুর পিতার সন্ধান পাই নাই, সকালে তার দর্শন ও পরিচয় পেলাম; প্রায় ত্রিশ বছরের যুবক, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ-গঠন কিন্তু দেহের স্নিগ্ধ শ্যাম বর্ণ তার নামের সার্থকতা জ্ঞাপন করছিল। অতীব অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্ট কথায় সে তার বংশের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছে।

বিঘা পঞ্চাশেক আবাদ জমি সংসারের একমাত্র ও স্বচ্ছল ব্যবস্থা। কৃষ্ণদাসের স্ত্রী পরমাসুন্দরী-বর্ণে, দৈহিকগঠনে। সে ভিন্ন গ্রামের এক বিধবার একমাত্র সন্তান, তখন তার পৃথিবীতে শ্বশুরের ভিটা ছাড়া দ্বিতীয় ভিটা ছিল না। বৃদ্ধ বৃদ্ধার অসীম আদরের পুত্রবধু।

পারিপার্শ্বিক সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এবার আমার কাহিনীর স্রোত সোনামুখীর স্রোতের মত চলুক, সোনামুখী তার মুখে সোনা এনে গ্রাম সোনাপুর করে তুলেছিল, আনার কাহিনীর স্রোত কী বুকে করে' আনবে তা এ কাহিনীর সমাপ্তিই একমাত্র জানে।

প্রভাত হ'ল। পূর্ব্ব রাত্রের ব্যাপারের পর আমার স্থিতিটুকু সে বাড়ীতে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল তার চতুর্দ্দিকে মহিমা নিয়ে, সচরাচর দৃষ্ট দেবতার ছবির মত আমার মস্তকের চারিপাশে বৃত্তাকার, একটি জ্যোতির ছটা নিয়ে গম্ভীর মুখে অধিস্থিত হ'য়ে গেলাম। সকালে মুখ হাত ধুয়ে রাত্রের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করবার জন্য বৈঠকে মোড়ার উপর বসে ছিলাম, মহিমায় নয়, ক্লান্তিতে স্থির উপবিষ্ট আমাকে অনেকটা সিদ্ধ পুরুষ যোগীর মতই দেখাচ্ছিল, মাঝে মাঝে নিজে সচেতন হ'য়ে মনে মনে হাসছিলাম। এমন সময় বৃদ্ধ আমার সম্মুখে এসে যুক্ত করে জানাল—

"ঠাকুর একটু গাত্রোত্থান করতে হবে যে।" চমকে বললাম—"কেন—?"

"আপনার জন্য সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করেছি, আমরা প্রসাদ পাব বলে—।" এই জন্য গাত্রোত্থান! গাত্রোত্থানের জন্য আমার উপরের চালে আগুন ধরিয়ে দিলেও সে চেষ্টা করতাম কিনা সন্দেহ।

"এখনও রাধামাধবের ভোগ হল না তার পূর্ব্বেই আমার—? সে কী কথা!" দেবতার নামে প্রস্তাবটি এড়িয়ে যাবার জন্য বললাম।

"আরে ছি! ছি! তা কি হয়। তিনি সর্ব্বাগ্রে, তাঁর বাল্য ভোগ কখন হয়ে গেছে, আজ থেকে কয়দিন তাঁর পূজাদির ভার অন্য একজন নিয়েছেন-পূর্ব্বেই ব্যবস্থা ছিল—

"কেন?"

"বাড়ীতে জন্মগত অশৌচ হল কিনা।"

"ওঃ—ঃ" বুঝলাম আমার প্রতি দেবতা বিরূপ।

"তা হ'লে কৃপা করে।—"

"চল।" আমি নিজেকে টেনে তুলে বৃদ্ধের অগ্রবর্ত্তী হলাম।

ভিতরে বারান্দায় একটি কোণে বেতের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তার অদূরে বারান্দার ধারে সুমার্জ্জিত গাড়ুতে জল, তদুপরি একখানা নূতন গামছা ভিজিয়ে ভাজ করা ছিল। অবসন্ন দেহ নিয়ে আমি বেতের আসনটিতে বসলাম। আসনটি স্থানীয়-প্রস্তুত অনেকটা সহর বাজারের সোফার মত, তার ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েই আরামে বোধ হয় চোখের শ্রান্ত পাতা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, কোন স্পর্শে চমকে উঠলাম। চোখ খুলে দেখি একটি নারী আমাকে প্রণাম করছে গলবস্ত্র হ'য়ে;

"এটি আমার স্ত্রী।" বৃদ্ধের পরিচয় পত্র।

"ও! তোমার স্ত্রী, বেশ; আশীর্ব্বাদ করি তুমি স্বামী সোহাগিনী, সাবিত্রী সমানা ও বীরমাতা হও।"পূর্ব্বে শোনা কতকগুলি আশীর্ব্বাদ বলে গেলাম।

"কিছুদিন আমাদের এখানে পায়ের ধূলো রাখতে হবে বাবা, দয়া যখন একবার করেছেন।" বৃদ্ধের স্ত্রী আমাকে বলল।

"কিন্তু আমার হাতে বেশী সময় নেই মা।"

"তা জানি আপনার কত ভক্ত, আমরা মহাপাপী, তবুও আমার কৃষ্ণদাসের চাঁদটুকু ঘরে আসা পর্য্যন্ত,—ন' দিনেই ঘরে আসবে, তাকে আশীর্ব্বাদ না করে আপনি যেতে পারবেন না।"

"তাকে আমি কাল রাত্রেই আশীর্ব্বাদ করেছি মা, তোমার নাতি পরম সৌভাগ্যবান পুরুষ হবে, কোন বংশে সে জন্ম নিয়েছে দেখতে হবে! পূর্ব্ব জন্মের বহু পুণ্যের ফলে সে তোমার ঘরে আশ্রয় পেয়েছে, তোমার রাধামাধবের অংশ নিয়ে তার জন্ম।" আমার কথা শেষ হলে দেখলাম বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজনেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে যুক্ত করে প্রণাম করল, কথা গুলোর প্রতি-ধ্বনি শুনে আমি নিজে চমকে উঠলাম; মনে মনে আমিও তাঁর প্রতি প্রণাম জানিয়ে বললাম—"বিপদে পড়ে যা বললাম তার জন্য আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর, তুমি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর, আমার মুখের আশীর্ব্বাদ যেন শিশুর জন্য তোমার মুখের কথাই হয়।" দেবতার কোন উত্তর পাই নাই।

জলযোগের ব্যবস্থা হ'ল, তার প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হলাম।

"এত সব কে খাবে রাধামাধব? এ যে দশজনের খাবার এত তাড়াতাড়ি যোগাড়ই বা করলে কী করে'?"

"আমরা আপনার প্রসাদ পাব। আপনার কৃপায় সোনাপুরের অভাব কিছু নাই।

"তোমরা শুধু, পাড়ার সকলে প্রসাদ পেতে পার এমন ব্যবস্থা করেছ।"

"ঠাকুরের মাহাত্যি—ঠিক জেনে ফেলেছেন, পাড়ার সকলেই প্রসাদের

জন্য ভিক্ষে করেছে, আপনার আশীর্ব্বাদে কাউকে বঞ্চিত করব না।”

অনিচ্ছায় সাধ্যমত সামান্য আহার করলাম, রাত্রি জাগরণের প্রধান আঘাত পড়ে ক্ষুধার ওপর, সকালের খাওয়া কোন দিন অভ্যাস নাই: শুনেছি দেবতা একবার দশের চক্রে পড়ে ভূত হ'তে বাধ্য হ'য়েছিলেন, আমার দুরদৃষ্ট, দশচক্রে পড়ে আমি দেবতা হ'য়ে সত্য দেবতার কাছে ত্রাহি ত্রাহি প্রার্থনা করলাম।

পরে জানতে পারলাম আমার সেই প্রসাদ কণিকা করে সমগ্র সোনা-পুরকে বিতরণ করা হয়েছিল।

আহারের পর বৈঠকে আশ্রয় নিলাম; সে ঘরখানাকে ইতিমধ্যে সুন্দররূপে পরিষ্কার করে তার একপার্শ্বে আমার জন্য একটি শয্যা রচনা করা হয়েছে' শয্যার প্রত্যেকটি দ্রব্য দুগ্ধফেননিভ শুভ্র পরিষ্কার এবং নূতন। ক্ষনেক অপেক্ষা না করে দেহ তার উপর এলিয়ে দিলাম। একটি জিনিসের অভাব অনুভব করছিলাম কিন্তু সেটার কথা কেও বলছিল না কারণ সেটি দেবভোগ্য নয়, অথচ আমার ভিতরের মানুষটি তার জন্য মৃত-প্রায়—সেটি চা। অনেক চিন্তা করে' বহুবার ইতস্ততঃ করে অবশেষে বলেই ফেললাম অর্থাৎ বলতে বাধ্য হলাম। ইতস্ততঃ কিংবা দ্বিধা কেন হল আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, সে প্রশ্ন আমি কয়েকবার নিজের মনকে করেছিলামও, বিশেষ সাড়া পাই নাই। মানুষ এমন মোহমুগ্ধ যে সে একবার উচ্চাসনে আসীন হলে সেটা থেকে নামতে চায় না এবং নামবার ভয়ও সর্ব্বদা থাকে। এটা মানুষের শ্রেষ্ঠ পঙ্কিলতা।

চা এল; সাহস পেয়ে তামাকের জন্য আদেশ করেই পেলাম, সুগন্ধি

তামাক নূতন হুঁকায় পান করে' ক্লান্ত দেহকে লম্বা করে দিলাম শয্যার উপর। মুহূর্ত্তেই গাঢ় নিদ্রা।

পরে আমার প্রতি দেবতার মত ব্যবহার বর্ষিত হতে থাকল আর আমি একটি উপদেবতার সেগুলো নির্ব্বিকারে সহ্য করতে লাগলাম।

বিপদের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় এল দ্বিপ্রহরে। সোনাপুরের সমস্ত নারী দ্বিপ্রহরে একত্রে আমাকে আক্রমণ করল। কিশোরী, যুবতী, অবিবাহিতা, বিবাহিতা, বৃদ্ধা, বিধবা কেহ বাদ নাই যায় দেখলাম ; ব্যাপার দেখে আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম।

"কি ব্যাপার, এরা কী চান।"

বাড়ীর কর্ত্রী বলল—"এরা সকলে আপনাকে প্রণাম করে' আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছে, আপনার মুখে ধর্ম্মকথাও শুনতে চায়।" সকলে ক্রমাগত প্রণাম করল, আমি একখানা হাত বুদ্ধের ভঙ্গিতে উঁচু করে' নীরব আশীর্ব্বাদ করে গেলাম, অর্থাৎ একদৃষ্টিতে শুধু দেখে গেলাম কারণ সরব আশীর্ব্বাদের সঞ্চয় আমার বেশী ছিল না। প্রণামান্তে সকলে আমাকে কেন্দ্র করে বসল, আমি শয্যার উপর আসীন।

পৌরাণিক ধর্ম্মকথা বিশেষ জানা ছিল না, যা জানা ছিল তা এত আবছা যে ধরা পড়বার যথেষ্ট ভয় ছিল সুতরাং কলেজে পড়া ফিলসফির ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিয়ে আত্মা, পরমাত্মা, দেহ ও মন প্রভৃতির বিষয়ে একটা ঢালা বক্তৃতা দিয়ে দিলাম, ভুল হয়ত হ'য়েছিল কিন্তু ধরা পড়বার ভয় ছিল না।

তারপর অনেকের হাত দেখলাম, বহু কিশোরীর ভবিষ্যৎ বললাম, বহু স্ত্রীর স্বামী ভাগ্যের ভবিষ্যৎ বললাম, অনেক যুবতীর ভাগ্যরেখা দেখলাম তার কপালে—অর্থাৎ কিছুতেই থামলাম না ; থামলাম তখন

যখন কয়েকজন আমার কাছে মাদুলী চাইল, দু-একজন দীক্ষা প্রার্থনা করল। মনে মনে বাংলার মেয়েদের সারল্যকে বাংলার ভাবপ্রবণতাকে, বাংলার মা বোনকে আমার প্রাণের প্রণাম জানালাম।

"আমি সন্ন্যাসী নই, মাদুলী দিতে জানি না; আর দীক্ষা? পরে দীক্ষা দেব, এ সময় ও স্থান উপযুক্ত নয়।"

মেয়েদের মত সোনাপুরের পুরুষেরাও পরে আমাকে আক্রমণ করেছিল, তারাও আমার বাণী শুনতে চেয়েছিল, তাদের কাছে ফিলসফি বলি নাই, আধুনিক স্বাধীনতা দাবীর বিষয়ে কিছু তপ্ত বক্তৃতা দিলাম, এই বিষয়টি এই ভেবে দিলাম ছড়িয়ে যে এত পাপ করেও যদি তাদের কিছু উপকার করতে পারি।

ফলে পরদিন যুবকরা আমাকে সভাপতি করে' সোনামুখীর তীরে আম্রকাননে বিরাট এক সভা করে, আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি, আমার চিৎকারে সোনামুখীর বুকে তরঙ্গ জাগে।

কৃষ্ণদাসের শিশুপুত্রের নামের জন্য বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাকে অনুরোধ করে—"ঠাকুর, আপনিই ওর নাম রেখে দিন, সেই নামে ও পৃথিবী আলো করুক।" বৃদ্ধ বলে। সমস্যায় পড়লাম, পৃথিবী আলো-করা নাম কিছুতেই মনে আসছিল না, গ্রামে নামের উপর এতটা [illegible]হ আশা করি নাই;

"ওর নাম থাক বিবেকানন্দ!"

"স্বামী বিবেকানন্দ! ও নাম দেবেন না ঠাকুর, ও যেন সন্ন্যাসী না হয়, সে যেন আমার ঘর ভরে দশগুন করতে পারে এই আশীর্ব্বাদ করুন।" বৃদ্ধ করযোড়ে যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। সোনাপুরে প্রথম বাধা পেলাম; বিবেকানন্দ কী শুধু সন্ন্যাসী ছিলেন? নিজের ঘর ভরতে

পারলেন না। ঠিক কিন্তু তিনি যে ভারতের অন্তর ভরে' দিয়েছিলেন সে খবর কে রাখে? বিষয়টা যুবকদের সভার জন্য রেখে দিলাম। বিরক্তিতে একবার ভাবলাম যে বৃদ্ধকে তার নাতির জন্য "ঘর ভরণা" নামটি দিই, বিহারে দেখেছি ও নামটির শক্তি আছে।

"বেশ ওর নাম রাখ বিবেক!" আমি বললাম, কারণ দেখলাম বৃদ্ধের আনন্দের জন্য শিশুর আনন্দটুকু বাদ দিতে হবে।

শিশুর একমাত্র নাম 'বিবেক'ই থাকল ও পরেও ছিল।

এর পরের ঘটনাগুলি আপনাকে কাহিনীর মত শুধু শুনিয়ে যাব আমি অলক্ষ্যে থেকে, কারণ আমার নিজের উপস্থিতি দিয়ে কাহিনীর স্রোতকে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না—কাহিনী নিজেই খরস্রোতা হো'ক খরস্রোতা সোনামুখীর তীরে, বহে চলুক দূর থেকে দূরান্তরে।

—তিন—

শৈশব

আধুনিক যুগে সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রিকায়, চিকিৎসা জগতের মুখপত্রে, নবীন চিকিৎসকদের প্রবীন বক্তৃতায় আমরা প্রায়ই শুনি যে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর অধিক হারের জন্য গ্রামের এরূপ আঙ্গিনাস্থ সাময়িক খড়ের ঘর প্রসবঘরের জন্য ব্যবহার, তার অবিজ্ঞান-সম্মত পরিস্থিতি বহুলাংশে এবং গ্রাম্য অশিক্ষিতা দাই অবশিষ্টাংশে দায়ী। অপরিচ্ছন্নতা, আলো ও বাতাসের অভাব দূষণীয় সভ্যতা মাত্রেই স্বীকার করবে কিন্তু সেই সুরে এ তথ্য ধরে নেওয়া অন্যায় হবে যে গ্রামের আতুরঘর মাত্রেই অপরিচ্ছন্ন, গগনচুম্বী প্রাসাদের আতুর-ঘরও অপরিষ্কার হতে পারে, ভারতের বহু মনীষী এমনি ভাবে আঙ্গিনার এক কোনে ক্ষুদ্র আতুর-ঘরে জন্মগ্রহণ করে' পৃথিবীর অন্যতম ব্যক্তি হয়েছেন। গ্রাম্য ধাত্রীও সুনিপুণা; আধুনিক সভ্যতা জর্জ্জরিত, অতি আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত প্রসূতি-আগারেও প্রসূতিকে নির্মমভাবে মরতে দেখেছি, সে সব ক্ষেত্রে মানুষের ভাগ্যের দোষ দেওয়া হয়, সে ভাগ্যস্তুতি গ্রামের নিভৃততম কোণেও তুল্য-শক্তিতে বিরাজ করতে পারে, তার অগম্য স্থান নাই।

নবাগত শিশুদেবতা বিবেকের ভাগ্যরেখায় কী লেখা আছে তা একমাত্র তার বিধাতাই জানেন, আমি শুধু এইটুকু দেখেছি যে তার জন্মস্থান নগণ্য হলেও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

জন্মের পর ষষ্ঠদিনে ব্রাহ্মণের পদধূলি দিয়ে শিশুর ভাগ্যরেখাকে সমুজ্জ্বল

করবার যে গ্রাম্যপ্রথা প্রচলিত আছে সেটা সুষ্ঠুরূপে সমাপ্ত হ'ল, প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী সেই দিন নাকি শিশুর ভাগ্যরেখা ভাগ্যবিধাতা লিপিবদ্ধ করেন, সুতরাং সেদিন আতুরঘরের দ্বারে কলম ও কালি রেখে দেওয়া হয়। কয়েকজন ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করা হয় এবং আনুষঙ্গিক পূজা পাঠান্তে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করা হয় শিশুর সুপ্রসন্ন ভাগ্য, এরূপ রীতি এখন অনেক আধুনিক প্রাসাদেও প্রচলিত আছে, মানুষ ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে সত্য কিন্তু তার অনিশ্চিত কার্য্যের ওপর আশা করতেও ছাড়ে না, পৃথিবীর দুর্ব্বলতম জীব এই মানুষ! সদ্যজাত শিশুর ভাগ্যের জন্য এরূপ অনুষ্ঠান হয়ত বা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অভাগা মানুষের জন্যও হয়েছে—সব কিছু ভেবেও সেদিন আমার পদধূলি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম—'ঠাকুর বিবেকের জন্য এই অনুষ্ঠান যেন সার্থক হয়।'

যথাসময়ে ষষ্ঠীপূজা করে' সুন্দর শিশু বিবেককে বৃদ্ধ রাধামাধব বুকে করে' মন্দিরে দেবতার পদতলে শুইয়ে দিল, শিশু স্বল্প পরিচিত জীর্ণ খড়ের ঘর ছেড়ে নতুন স্থানে এসে উপর দিকে চঞ্চল অস্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, মুহুর্মুহু তাকাতে লাগল সম্মুখের পাষাণ দেবতার দিকে।

"অ—ই—ই—" দেবতার দিকে তাকিয়ে শিশু তার অবোধ্য ভাষায় বলে' আকাশের বুকে তার হাতপা ছুড়তে লাগল। অস্ফুট এই 'অ-ই ই' শব্দের কোন অর্থ নাই, কোন ভিত্তিও নাই, সাধারণের কাছে সেটা একটা শব্দই নয়, কিন্তু শিশুর চতুর্দ্দিকে যারা দাড়িয়েছিল তারা সেটার বিবিধ প্রকার অর্থ করল।

"শুনলে দিদি-শুনলে! ওমা এযে পষ্ট ঠাকুরকে ডাকল—" পাড়ার একটি স্ত্রীলোক রাধামাধবের স্ত্রীকে তার মন্তব্য শোনাল।

'ঠাকুর ওর ডাক শুনুন—ওকে পায়ে মুছে দিন—"রাধামাধবের স্ত্রী ঠাকুরের দিকে যুক্তকরে প্রণাম করে' বলল।

"ডাকবে না—ওযে ঠাকুরেরই অংশে জন্মেছে, এই ঠাকুরই বলেছেন ওঁর কথা কী মিথ্যে হবার" রাধামাধব আমার দিকে একবার তাকাল "আমার বৌমার গর্ভে স্বয়ং নরায়ণ এসেছেন—আমার লক্ষ্মী মা—" বৃদ্ধ পার্শ্বের বৌমাকে আদর করল তাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে, নারায়ণকে গর্ভে রাখার গৌরবে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী সম্মুখে তাকাতেই অদূরে দণ্ডায়মান কৃষ্ণদাসের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভীতা হরিণীর মত শ্বশুরের বুকে মুখ লুকাল, ছলছল নেত্রে বৃদ্ধ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"আমার দাদার কপালে রাজতিলক আছে হে রাধামাধব, আমি স্পষ্ট দেখছি' রাজতিলক—তুমি দেখে নিও আমার কথা ফলে কি না—" গ্রামের পুরোহিত কথাটা বলতে বলতে দক্ষিণার মুদ্রা ও নৈবেদ্য নিজের গামছায় বাঁধতে লাগলেন।

"আমার দেখার ভাগ্য হবে না ঠাকুরমশায়, আপনার কথা ঠাকুরের কথা হ'ক।"

"ওরে, চাঁদকে একবার কৃষ্ণদাসের কোলে দেত—দেখে আমাদের চক্ষু জুড়োক—কই গো বৌমা একবার দাও ত ওর কোলে—" গ্রামের জনৈক প্রৌঢ়া কৃষ্ণদাসের স্ত্রীকে বলে ;

"নাও না ঠাকুরপো একবার কোলে—এমন সুন্দর মানাবে, এস আমি তুলে দিচ্ছি তোমার কোলে—" একজন বধূ সচেষ্ট হ'লে কৃষ্ণদাস এক দৌড়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। উপস্থিত সকলে খিল খিল্ করে হেসে উঠল। "ঠাকুরপো লজ্জা পেল, আচ্ছা দেখা যাবে এ লজ্জা কদিন

থা[illegible]” উত্তরে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী মাথার ঘোমটা একটু সম্মুখে টেনে [illegible]

অবোধ্য হ’লেও শিশু একটা যাহ’ক শব্দ করেছিল যার উপর ভিত্তি করে’ উপস্থিত সকলেই কিছু না কিছু মন্তব্য করল, কিন্তু পাষাণ দেবতা পাথরই থেকে গেলেন।

মন্দির থেকে রাধামাধব শিশুকে বুকে করে’ নিজের ঘরে তুলবার আয়োজন করল, মেয়েরা হুলুধ্বনি দিল, শঙ্খধ্বনি হ’ল, শিশুর সম্মুখ দিয়ে একজন গঙ্গাজল ছিটিয়ে, একজন লাজ ও পয়সা ছিটিয়ে ও একজন ঘৃতের প্রদীপ নিয়ে চলল, শিশুর মাতা চলল রাধামাধবের পাশে পাশে।

সাড়ম্বরে শিশু তার ঘরে এল।

রাধামাধবের নিজের ঘরে এসে দাঁড়াতেই শিশু তার পিতামহের বুক ভরে নির্ব্বিকার চিত্তে মূত্রত্যাগ করল, বৃদ্ধের বুক ও ফতুয়া ভিজে গেল;

“হ’ল—! ঠাকুর্দ্দার গা ভরে প্রথমেই—”

“তা করুক বৌমা’ এই ত আমার গর্ব্ব, এর জন্যেই আমি এতদিন বেঁচে আছি—আমাকেই ও সর্ব্বপ্রথম আপন করে’ নিল, এ আমার পূর্ব্বপুরুষের আশীর্ব্বাদ—” গ্রামের জনৈক বধূর কথার উত্তরে সে গর্ব্ব প্রকাশ করল।

“জামাটা ছেড়ে ফেলুন বাবা। একেবারে ভিজে গেছে, ওকে দিন আমার কাছে—” কৃষ্ণদাসের স্ত্রী শিশুকে নেবার জন্য হাত বাড়াল।

“না, মা, ওতে আমি ভুলছি না, একে এখন আমি দেব না, আমাকে ঠকিয়ে দেবে তুমি?” সে হাসে পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে।

“বাবা যে কি বলেন! আপনাকেই সব সময় রাখতে হবে, এর পর বললেও আমি নেব না, আমার কাজের সময় রাখবে কে?

"সব সময় আমি রাখব বৌমা। আমার দাদুর চব্বিশঘণ্টার চাকর হব— মাইনে চাইনে, শুধু বুকে রাখতে দিও—" মুদ্রিত নেত্রে সে শিশুকে [illegible] চেপে ধরে।

"জামাটা ছেড়ে ফেলুন—ওটা ভিজে গেছে—"

"পাগলি। এর নাম ভিজে! ও আপনিই শুকিয়ে যাবে।"

"এখনি কা হয়েছে—এর পর গা ভরে, মাথা ভরে সব কিছু করবে—" গ্রামের একজন প্রৌঢ়া হেসে বলেন।

"সেই আশীর্ব্বাদ করুন বৌ'ঠান, দাদু যেন তেমনি ভাবে বাড়তে পারে—"

সমস্তদিন শিশুকে কেন্দ্র করেই কেটে গেল, গ্রামের সমস্ত নরনারী, শিশু ও মুসলমান সকলেই একে একে এসে দেখে গেল, মন্তব্য করে গেল, কাহারোই অবশ্য প্রথম বা দ্বিতীয় বার দেখা নয়, তবুও সেদিনের কথা যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দ্বিপ্রহরে মেয়েরা তাকে কেন্দ্র করে' সমগ্র সোনাপুরকে মুখরিত করে তুলল, কৃষ্ণদাস যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়েছিল লজ্জায়। রাত্রি পর্য্যন্ত ভিড় কমেছিল বটে কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। শোবার পূর্ব্বে একটা সমস্যা উঠল শিশু ও তার মাতা কোথায় শোবে।

"কিছুদিন এখন ছেলে ছেলের বউ একসঙ্গে রেখ না দিদি, অন্ততঃ দুতিন মাস—এটা দরকার বুঝলে না?" প্রতিবেশী দাশুরায়ের স্ত্রী দাশগিন্নীকে কথাগুলো বলে কথার গূঢ় অর্থটা নীরব ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, অদূরে বসে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী শিশুকে তেল গরম করে সেঁকে দিচ্ছিল, চৌকির উপর রাধামাধব শিশুর দিকে তাকিয়ে ছিল, দৃষ্টিতে তার তখন আফিমের পুরাতন আমেজ;

"কী জানি দিদি, কী করব ঠিক করতে পারছি না, আমারও ইচ্ছে কিছুদিন আলাদা থাক—কী করব ঠিক করতে পারছিনা—" শাশুড়ীর কথাটা শেষের দিকে বধূকে যেন জাগরিত করল, সে এতক্ষণ শিশুকে সেঁক দিতে দিতে চলে গিয়েছিল পাশের ঘরে, কল্পনায় ভাবছিল যেন স্বামীর সম্মুখে সে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল, সম্মুখের রাত্রের কল্পনাকে যুবতী বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করতে করতে শাশুড়ীর কথায় আকস্মাৎ এইঘরে ফিরে এল, কল্পনাটি যেন মুহূর্ত্তে সাদা হ'য়ে গেল।

"না—না, বউ মা ঐ ঘরেই শোবে, তোমরা বোঝ না ওদের একটু সাধ আহ্লাদ আছে, কারো আনন্দে বাধা দিতে নেই," রাধামাধব দৃষ্টির সম্মুখে হয়ত নিজের জীবনের পূর্ব্বস্মৃতিকে দেখতে পেয়ে প্রস্তাব করলো, অকস্মাৎ তার দৃষ্টির সম্মুখে একটি বিগত দিনে পুরাতন স্মৃতি হ'য়ে উঠল।

"আমারও তাই সাধ গো, তবে আর একটা দিকও ত ভাবতে হবে—"

স্ত্রীর কথায় রাধামাধব বল্লে—"সেটাও আমি ভেবে দেখেছি, এখনকার ছেলেমেয়ে, বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি হ'য়েছে—ওরা আমাদের চেয়েও বেশী বুঝতে পারে—মানসিক বাধাটা আরো ক্ষতিকর, কী বল বৌঠান—?"

শ্বশুরের কথাগুলো কৃষ্ণদাসের স্ত্রীর এত ভাল লাগল।

"তাই শোবে। বউমা আমার খুব বুদ্ধিমতী, মাস দুয়েক একটু বুঝে চললেই হ'ল, কাঁচা পোয়াতি! যাও বৌমা চাঁদকে শুইয়ে দিয়ে চল খেয়ে আসি, বেশী রাত করা ঠিক নয় এই কাঁচা শরীরে।"

"আপনি শুইয়ে দিয়ে আস্থন মা—"

"কেনরে পাগলি? লজ্জা করছে বুঝি?" শাশুড়ীর কথায় বধূর লজ্জা আরও যেন বেড়ে গেল।

"করবেইত। আমরা তুমাস সামনে বের হ'তে পারিনি, মাথায় যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ত—" রায়গিন্নী বলল।

"না না, লজ্জা কী! যাও বেশ ভাল করে বিছানা করে' শুইয়ে দিয়ে এস, মাঝখানে ওর বিছানা করো না যেন, খোকার ত যা হাত পা ছোড়া—চল খেয়ে আসবে চল, রাত হ'ল, লুচি কখানা জল হ'য়ে যাবে। যাও—ওঠো!" এবার বধূ যেন নিজেকে টেনে তুলল, লজ্জায় তার পাদুটো জড়িয়ে আসছিল।

"আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে যাও বৌমা, কতক্ষণ আবার ও চাঁদমুখ দেখব না।" রাধামাধব যেন প্রার্থনা জানায়।

"আপনি ততক্ষণ রাঁখুন না বাবা, আমরা খেয়ে এসে নিয়ে যাব—"

"না না এবার আমি শোব বৌমা। তুমি শুধু একবার দেখিয়ে নিয়ে যাও—"

বৃদ্ধ নিদ্রিত শিশুকে একবার বুকে নিয়ে তার কপালে চুম্বন করল—দীর্ঘ সস্নেহ চুম্বন।

"ঘুমন্ত অবস্থায় চুমো খেও না—"

"কেন?" রাধামাধব স্ত্রীর কথায় প্রশ্ন করে।

"ওতে ছেলে কামুক হয়।"

"পাগল, ও আমার নাতি, নাও বৌমা—"

পুত্রবধূ শিশুকে নিয়ে যাবার সময় শাশুড়ী বলে দিল "খোকা ঘুমিয়ে থাকলে তাকে জাগিয়ে দিয়ে এস, চলো তুমি ঘরে না যাওয়া পর্য্যন্ত যেন জেগে থাকে, ওকে তুলে দিয়ে এসো—যাও।"

সে পুত্রকে নিয়ে দ্বিধা ও লজ্জা জড়িত পদে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করল, এইটুকু পথ যেতে সে যেন ঘেমে উঠল, আপাদ মস্তক অবর্ণনীয় শিহরণ তার গতিকে পদে পদে মন্থর করে দিচ্ছিল।

ঘরে ঢুকে দেখে স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে, শিশুকে নিঃশব্দে শুইয়ে দিয়ে দুপাশে দুটো বালিস দিয়ে বেষ্টন করে দিল, স্বামীর নিদ্রা তার লজ্জাকে অনেক লঘু করে দিল, কয়েকবার ইচ্ছা করলেও সে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গাতে পারল না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

"খোকাকে জাগিয়ে দিয়ে এসেছ বৌমা।" শাশুড়ীর প্রশ্নে সে মাথা নেড়ে একটা মিথ্যা প্রকাশ করতে বাধ্য হল।

"বাবা আপনি শুয়ে পড়ুন ; আপনার মশারি ফেলে দিয়ে যাই—"

"না বৌমা, তোমরা খেয়ে এস তারপর শোব। তুমি বরং একটা কলকে ধরিয়ে দিয়ে যাও—" পুত্রবধু শ্বশুরের জন্য একটি কলিকায় অগ্নিসংযোগ করে হুকোটীর উপর বসিয়ে নলটি তার হাতে দিয়ে খেতে গেল।

ওঘরে কৃষ্ণদাস মোটেই ঘুময়নি, সারাক্ষণ জেগেই ছিল, স্ত্রীর পদধ্বনি শুনে শুয়ে পড়ে ঘুমের ভাণ করেছিল, স্ত্রী এসে তাকে জাগরিত দেখে এই লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য, শিশুকে শুইয়ে চলে যাবার পর কৃষ্ণদাস দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল, যখন বুঝতে পারল স্ত্রী খেতে গেল মার সঙ্গে তখন সে উঠে বসল এবং ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, প্রথমে কেমন লজ্জা করছিল, নির্জ্জন ঘরে নিদ্রিত পুত্রকে দেখতে এ লজ্জা সে কোথায় পেল তার উত্তর বর্ত্তমান সমাজের আমি দিতে পারব না।

ওঘরে রাধামাধব তামাকের কুণ্ডলায়িত ধূম্র রেখায় বুকে অসংলগ্ন কল্পনার মধ্যে অকস্মাৎ একবার ভাবল—"খোকা হয়ত আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, দাদু গড়িয়ে যদি পড়ে যায়—" একবিন্দু সরে যাবার ক্ষমতা যে শিশুর নাই তখন, সে কথা সে যেন জানেই না, হুকোটি হাতে করে খালি পায়েই ধীরে ধীরে কৃষ্ণদাসের ঘরের সম্মুখে এসে ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালো, যে দৃশ্য দেখলো তাতে তার নিজেরই লজ্জা হল, দেখল কৃষ্ণদাস স্থির দৃষ্টিতে শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, রাধামাধব সে দৃশ্য দেখে ফিরে এল নিজের ঘরে, নিজের শয্যার উপর বসে জোরে জোরে হুকোটায় টান দিতে লাগলো, কলকের আগুন বহুপূর্ব্বে নিভে জল হ'য়ে গিয়েছিল।

"একী বাবা, আপনি এখনও শোননি," পুত্রবধূর কথায় তার ধ্যান ভাঙ্গে।

"এই যে মা এবার শোব, ভাবলাম খোকার যা ঘুম, দাদু একা আছে, তোমরা এলে তারপর ঘুমব—এবার আমি শোব। মাধব—মাধব!"

শ্বশুর শাশুড়ীকে শুইয়ে বধূ নিজের ঘরে ফিরে এল, এবার যেন তার পা হিমালয়ের মত ভারী হ'য়ে গেছে, বুকের ভিতর কে যেন চেপে ধরেছে, ফুলশয্যার রাত্রেও তার এত লজ্জা হয়নি বোধ হয়। স্ত্রীর আগমনের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে কৃষ্ণদাস আবার শুয়ে পড়ে ঘুমের ভাণ করল।

দ্বার বন্ধ করে স্বামীকে নিদ্রিত দেখে সে কিছু সাহস পেল। কৃষ্ণদাসের শোবার ঘরে প্রবেশের সুযোগ ও সুবিধা ইতিপূর্ব্বে আমাদের হয় নাই, এখন হ'ল, অন্যায় এবং রুচিমার্জ্জিত না হলেও আপনার জন্য এটির প্রয়োজন। ঘরখানি নাতিবৃহৎ, আলো বাতাসের অবাধ

খেলার সুবিধা সে ঘরে আছে, তার পার্শ্বেই বাইরের দিকে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান, নানা জাতীয় দেশী ফুলের ও সাধারণ গোলাপের গাছে সেটা পর্য্যায়ক্রমে সারা বছরই ভরে থাকে, বাগানের ফুলে গৃহদেবতার পূজা হয়, গাছে যা থাকে বাড়ীর শোভাবর্দ্ধন করে এবং রাত্রে মৃদুগন্ধ এসে এই সুখী দম্পতির প্রাণের গন্ধে মিশে যায়। বাগানের যত্ন কৃষ্ণদাসের অন্যতম কার্য্য—!

ঘরখানার ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিনিসপত্রগুলি যা আছে সুন্দর ভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সজ্জিত যে জন্য সেটাকে ভারাক্রান্ত মনে হয় না, কাপড় জামা থেকে ষ্টীলের বাক্সটি পর্য্যন্ত স্বল্প ও যথাস্থান দখল করে আছে, কৃষ্ণদাস বা তার স্ত্রী চোখ বন্ধ করে ঘরে ঢুকে কোন্ জিনিস তুলে নিতে পারে—এমন সুবিন্যস্ত সেগুলো। ঘরের একপাশে একখানা টেবিলের উপর কয়েকখানা বই, দোয়াত কলম, একটি টাইমপিস্ ঘড়ি, এবং আরো দুএকটা টুকিটাকি জিনিস সুন্দরভাবে সাজান, টেবিলটির মাঝখানে একটা ভাঙ্গা কাঁচের গ্লাসে জল দিয়ে দেশী ফুলের গুচ্ছ রাখা হয়েছে, টেবিলটার ওপর সাড়ীর পাড় দিয়ে সুন্দর ঢাকনা পাতা, সম্মুখে তার একখানা কাঠের টেবিল। ঘরের একপাশে দেয়ালের কাছে একখানা বড় চৌকির ওপর পরিষ্কার শয্যা, দেওয়ালে দেবদেবীর ছবি, শয্যার মাথার দিকে কিঞ্চিৎ নীচু করে' কালিঘাটের কালীর ছবি—ছবির নীচের অংশ কাঁচে সিঁদুর ও চন্দন চর্চ্চিত। মোটের ওপর ঘরের আবহাওয়াটি সুরুচি ও বোধ হয় কিছু সৌখিনতারও পরিচয় দেয়। কৃষ্ণদাস সারাদিন মাঠে মাঠে নিজের জমিজমা তদারক করে' বেড়ায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে; রৌদ্র ও বৃষ্টিতে দেহের প্রতি শিরা ও পেশী সুপুষ্ট হ'য়ে গেছে, জনমজুরের সঙ্গে সমানে পরিশ্রম

করে নিজের গোলা ভরে ফেলে—কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে সে যেন সম্পূর্ণ ভিন্নব্যক্তি, হাত পা ধুয়ে, মন্দিরের পর্ব্ব সেরে নিজের ঘরটিতে সে এই আবহাওয়াই চায়, রাত্রে যেটাকে আরও মধুরতর করে' তোলে, তার স্ত্রীও একই প্রকৃতির, সারাদিন সব কাজ হাসিমুখে করে, দরকার হ'লে ঘুঁটেও দেয়, রাত্রে রন্ধন শেষ করে' নিজের ঘরে এলেই সে যেন ফুলশয্যার বধূ হ'য়ে যায়।

স্বামী স্ত্রীর বড় মধুর আশ্রয় এই ঘরটি।

তুজনের মধুরতম সম্পর্ক।

সে প্রতিদিনই রাত্রে সে ঘরটায় আসে, আসার পূর্ব্বে তার মন আনন্দে তুলতে থাকে, প্রতি রাত্রেই সে প্রবেশ করে মনের ওপর ভিন্ন রংএর ছাপ নিয়ে, নানা কথার জাল রচনা করে, স্বামীর সঙ্গে কথা কিছুক্ষণ বলে' ঘুমিয়ে পড়ে, ভোরে ওঠে যেন নতুন জীবন নিয়ে, যেদিন স্বামী তার আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে সেদিন তাকে ডেকে তোলে, কিছুক্ষণ কথা না বল্লে যেন ঘুমই আসে না, ভোরে উঠে মনে হয় যেন গত রাত্রে সে কী একটা হারিয়েছে কিংবা পায় নাই।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম নিয়ে বহুদিনের রচিত কাহিনী।

আজ ঘরে প্রবেশ করে তার সারা দেহ লজ্জায় যেন অবশ হ'য়ে আসছিল, যেমন হ'ত বিবাহের পরে কিছুদিন। ধীরে ধীরে শিশুকে চৌকির ওপর দেওয়ালের দিকে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে শুইয়ে দিল, অতি সন্তর্পনে যাতে কৃষ্ণদাসের ঘুম না ভেঙ্গে যায়, মাঝে তার নিজের স্থান। শিশুকে শুইয়ে, তার কাঁথাগুলো মাথার কাছে ভাঁজ করে রেখে ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে, মশারি ফেলে অতীব সন্তর্পনে শিশু ও স্বামী মাঝে শুয়ে পড়ল, যাতে স্বামীর নিদ্রার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না হয়।

স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ থেকে শোওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস সমস্ত লক্ষ্য করেছে মাঝে মাঝে স্ত্রীর অলক্ষ্যে চোখ খুলে দেখে, ব্যাপারটা কতদূর যায় দেখবার জন্য সেও কিছু বলে নাই, সে রাত্রে তার যেন কি রকম একটা ভাব হচ্ছিল, জীবনে যেন কিছু নতুন, অস্থিরীকৃত অশৃঙ্খলিত কতকগুলো কল্পনা মনের ভিতরে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল, কোন সূচীপত্র নাই, কোন ধারাবাহিক কাহিনীও নাই, অথচ কবিতার মত একটা সুর আছে।

নিজের জায়গায় শুয়ে স্ত্রীও চঞ্চল হ'য়ে উঠছিল, এমন খুব কম দিনের কথাই মনে পড়ে যেদিন সে শুতে এসে স্বামীর সঙ্গে গল্প না করে ঘুমিয়েছে, স্বামী ঘুমিয়ে গেলেও তাকে ডাকার বিশেষ পদ্ধতি তারা নির্ব্বাচন করে রেখেছিল, ঘুম ভাঙ্গালে কৃষ্ণদাস স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরত বুকের পাশে, গালে এঁকে দিত দীর্ঘ একটি চুম্বন, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত; আজ সেটার ব্যতিক্রম বধূকে যেন পাগল করে তুলছিল, অথচ ভয়ানক লজ্জা আজ তাকে যেন স্থবির করে দিয়েছে। এমন দোলায় সে কোন দিন দোলে নাই; নারীর লজ্জা অবশেষে তাকে বাধা দিল প্রিয় কার্য্য থেকে।

সে জোর করে শিশুর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। কিছুক্ষণ অসহনীয় স্তব্ধতা দুজনকেই আঘাত করল।

"লতা—লতা—লতু—" কৃষ্ণদাস তার স্ত্রীকে ডাকল; এখন প্রকাশ করা যাক যে তার স্ত্রীর নাম বিদ্যুত্‌লতা, গ্রামে নামের বেশী প্রয়োজন নাই বিশেষ বধূশ্রেণীর স্ত্রীলোকের, শ্বশুর শাশুড়ী গ্রামে পুত্রবধূকে নাম ধরে ডাকে না, অন্যান্য সকলেও একটা কিছু সম্পর্ক ধরে ডাকে, প্রকৃতপক্ষে না থাকলেও, স্ত্রীর নাম ধরে ডাকা দিনে বা কাহারো সম্মুখে অচিন্তনীয়, বাপ মা বেঁচে থাকলে গুরুজনের সম্মুখে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য

করে' কোন কথা বলা আজকালও হয়ত অপ্রচলিত, নাম ধরে ডাকা দূরের কথা, বাপ মা মারা যাবার পর স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকার বয়েস থাকে না, তখন সেটা 'ওগো,' 'শুনছ' প্রভৃতি সাঙ্কেতিক চিহ্নে পর্য্যবসিত হয়। গ্রামের অন্যান্য স্বামী কি করেন জানি না, কৃষ্ণদাস কিন্তু রাত্রে তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডেকে অন্তরের নব্য হাওয়ার পরিচয় দিত।

"লতু—লতু" কৃষ্ণদাস পুনরায় ডাকল, বেশী আদরের সময় লতা লতু হ'য়ে যেত। লতা কিন্তু প্রথম ডাকই শুনতে পেয়েছিল, উত্তর দেবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু লজ্জা যেন তার গলার স্বর বন্ধ করে' দিল। দ্বিতীয় ডাকের সুরে তার লজ্জা আরও বেড়ে গেল। কোন সাড়া না পেয়ে কৃষ্ণদাস এবার তার কাঁধে মৃদু নাড়া দিয়ে ডাকল—"লতু—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?—এই !"

"উঁঃ উঁ—" লতা সাড়া দিল।

"ঘুমিয়ে পড়েছ ? সত্যি ঘুমিয়েছ ? এইত শুলে—"

"না ঘুমইনি—" লতা বলতে পেরে খুসি হ'ল।

"তবে আমার ডাকে জবাব দিচ্ছ না যে—আমাকে আজ ডাকনি কেন ? এত আমি উল্টো করলাম ; তোমারইত ডাকার কথা।"

"আমার লজ্জা করল যে !"

"লজ্জা ? সেকী কথা ! আজ এত দিন পর এ লজ্জা ? ওরে পাগলি" কৃষ্ণদাস স্ত্রীকে আকর্ষণ করে নিজের বুকের কাছে নিয়ে এল, তার কপোল, গাল, ঠোঁট, মুখ সর্ব্বত্র যেন উন্মত্তের মত চুম্বন করে গেল, অনেক গুলো অবিশ্রাম—তার পর যখন সে লতাকে তার বুকের মধ্যে সজোরে চেপে ধরল তখন দুজনেই হাঁপাচ্ছে, স্বামীর বুকের তলে লতা প্রার্থনা করল "ঠাকুর আমি যেন এই ভাবে মরতে পারি !"

দুজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকল।

লতু—"

"কী—?"

"আজ তোমার কিসের লজ্জা বললে না ত! কিসের লজ্জা বল—।"

জানি না যাও—! দুজনেই জানে কিসের লজ্জা।

"ছেলে হয়েছে বলে—না?"

যাও:—তুমি ভারী দুষ্টু!"

"এত গর্ব্বের কথা লতু, বাপ মা কত খুসি হয়েছেন দেখছ ত?"

"সত্যিই, তাঁদের আনন্দ যেন ধরছেনা—এত খুসী হয়েছেন তাঁরা, তখন দেখলেত?—এর পরেও দেখবে।"

"আচ্ছা লতু তুমি খুসী হওনি?" এ প্রশ্নের উত্তর স্ত্রী দিতে পারে না, এ প্রশ্নের উত্তরই কী হবে? "কই, কিছু বলছ না যে—"

"জানিনে যাও—তুমি বড় লজ্জা দাও! মন্দিরে এমন লজ্জায় আমি পড়েছিলাম—।"

"কখন?"

"যখন তোমাকে কোলে নিতে বললেন সকলে, আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি, হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম—পরে বুঝতে পেরে—"

"আমিও লজ্জা পেয়েছিলাম"

সে তোমার দৌড় দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—ছেলে তোমার পছন্দ হয়েছে ত?" শেষের অংশ লতা কিছু ভেবে বলে, এ প্রশ্ন হয়ত প্রত্যেক স্ত্রী প্রথমবার তার স্বামীকে করে, এটার জন্য যেন স্ত্রীই দায়ী, সন্তানের সৌন্দর্য্য যেন স্ত্রীরই কৃতিত্ব।

"আমি দেখিই নাই ভাল করে।"

"ওমা ঃ সেকী কথা ? এত দিন হ'য়ে গেল—"

"তুমি ত আতুড়ে ছিলে—সময় কোথায় ? আর এছাড়া সব সময় লোকের ভিড় ত লেগেই ছিল, তোমার আতুড় ঘরে উঁকি মেরে ত আর দেখতে পারিনে ?"

"কেন আজ মন্দিরে দেখনি ?"

"সামান্য একটু একবার কি দু'বার ; অত লোকের মধ্যে বারবার তাকাতে আমার লজ্জা করছিল। এখন দেখাওনা—দাড়াও আলোটা আমি আনি—" কৃষ্ণদাস নিজেই উঠে আলোটা এনে তাকে বাড়িয়ে দিয়ে এমন জায়গায় রাখল যাতে সমগ্র বিছানাটা সুস্পষ্ট আলোকিত হ'য়ে উঠল। কৃষ্ণদাস স্ত্রীকে তুলে তার সম্মুখে বসল, দুজনের দৃষ্টিই নিবদ্ধ হ'লো ঘুমন্ত শিশুর সুন্দর মুখের উপর। দুজনেই মুগ্ধ হ'য়ে গেল। লতা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাতেই দেখল সেও তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, সে খুব, খুবই লজ্জা পেল, লজ্জায় সরে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখটা লুকিয়ে ফেলল।

"ঠিক তোমার মত রং পেয়েছে লতু।"

"আর, দেখ তোমার মত মুখখানা—নাকটা, চিবুকের এই টুক্ পালটা—ঠিক তোমার মত—না ? সকলেই বলছে।"

"আর চোখ দুটো ঠিক তোমার মত সুন্দর হয়েছে, ভাগ্যিস আমার রং পাইনি—!"

"ও কথা বলোনা—তুমি আমার শ্যামসুন্দর ! ও তোমারই ছায়া—" লতা স্বামীকে টিপ করে' একটা প্রণাম করে ফেলল।

"লতু—!"

"কী—?"

"একটা কথা বলব।"

"কী বল—"

'আগে কথা দাও আমার কথা রাখবে। তারপর বলব।"

'কী এমন কথা? যদি আমার সাধ্যের বাইরে হয়।" লতা উৎসুক ও ভীত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

'পাগল, সে রকম কথা কী বলতে পারি, তোমার সাধ্যের মধ্যে—এবং অন্যায় কথাও নয়।"

"বল—নিশ্চয়ই রাখব।"

"ছেলেকে তুমি একটু কোলে নাও— আমি দেখব, আমার বড় সাধ!"

'ও :—তুমি ত বড় দুষ্টু। ও আমি কিছুতেই পারব না—মরে গেলেও না। না—না—না—" লতা লজ্জায় স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

"তুমি কথা দিয়েছ লতু। কথা দিয়ে না রাখলে কী হয় জান—?"

আধুনিক সভ্যতায় আলোকিত নগরের প্রাসাদেই হোক বা কুটীরেই হোক স্বামীর এইচ্ছা যেমন হাস্যকর স্ত্রীর এ লজ্জাও তেমনি অদ্ভুত, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী নিজের সন্তান কোলে নেবে তার কোন কাহিনী থাকতে পারেনা কিন্তু তবুও এইটুকু সামান্য ব্যাপারে গ্রামের দম্পতির রোমাঞ্চ হয়, বহুক্ষণ অনুরোধ করার পর লতা তার সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে মাথাটা লজ্জায় এত নীচু করে দিল যে সন্তানের বুক তার চিবুক স্পর্শ করল।

"ওকী—অমন করে থাকলে আমি দেখব কী—মুখ তুলে ভাল হ'য়ে বস, যেমন লোকে বসে—" অনেক সাধ্যসাধনার পর লতা সোজা হ'য়ে বসল। কৃষ্ণদাস স্ত্রীকে চুমু খেয়ে, নিদ্রিত শিশুর কপালে চুম্বন করল, শিশুর প্রতি পিতার এই আদর প্রথম আদর—দেখে লতার চোখ ভরে আনন্দ ও গর্ব

উপচে পড়তে লাগল। নারীর পক্ষে এতবড় গর্ব্বের মুহূর্ত্ত আর কখন আসে জানি না।

"ঘুমন্ত ছেলেকে চুমু খেওনা—" মৃদু হেসে লতা বলল।

"কেন ? কী হয়—" কৃষ্ণদাস কিঞ্চিৎ এস্ত হয়ে বলল।

"ছেলে কামুক হয়—" লতার চোখে দুষ্ট হাসি।

"আমার ছেলে—"

"চুপ কর। তোমার ছেলে বলেই ও ভয় বেশী—ভরসা যে ও বাবার নাতি—!'

দুজনেই হাসে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে শিশু প্রথমে উস্‌খুস্ করে শেষে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়।

লতা মহা বিপদে পড়ল ;

শিশুর ক্রন্দনের সব সময় হেতু থাকে না, কোন সময় হেতু থাকলেও ক্রন্দন সমান সুরে চালিয়ে যাবার কোন হেতুই খুঁজে পাবার উপায় থাকে না ; লতা প্রথমে শিশুকে চুপ করাবার জন্য তার দেহের উপর মৃদু চাপড়াতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোলটাকে দুলিয়ে তাকে দোলনার আভাষ দেবার চেষ্টা করল, তার ফলে তার ঘুম পাতলা হ'য়ে ক্রন্দন বেড়ে গেল বরং,—নিরুপায় লতা শিশুর কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চুলের ভিতরে আঙ্গুল চালিয়ে তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে আরাম দেবার চেষ্টা করল, ফল ত হলোই না, সুর বরং সপ্তমে চড়ে গেল।

ছেলে নিয়ে লতা মহাবিপদে পড়েগেল।

"তুমি একটু সরে বসত !—বরং তুমি শুয়েই পড়—" স্বামীকে লতা অনুরোধ করল।

'কেন—? আমি কী করলাম—?"

"যা বলছি করনা—নয়ত ও থামবে না—দেখছ না !"

"সে কী? আমাকে দেখেই কাঁদচ্ছে নাকি?" কৃষ্ণদাস অবাক হ'য়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

"নাগো না—দুধ না দিলে এ ছেলে থামবে না।"

"বেশত দাওনা—আমিত আর মানা করছি না—" ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৃষ্ণদাস একটু দুষ্টামি করেই বলল।

"কী ছেলেমান্‌সি করছ! তোমার সামনে বসে দুধ দেব কি করে? শিগ্‌গির শুয়ে পড়, এক্ষুনি মা ছুটে আসবেন—তখন তুমি সামলিও তা বলে দিচ্ছি—দেখছ ছেলের চিৎকার!"

'বেশত দাওনা দুধ—আমার সামনেই দাও—" স্বামীর ঠোটে মৃদু হাসি দেখে লতাও হেসে ফেলল।

"দুষ্টুমি কর না লক্ষ্মীটি—মা জেগে গেলে অনর্থ হ'য়ে যাবে—ছেলেটাও যে গেল এদিকে গলা শুকিয়ে—কই সরলে?" শেষের দিকে লতার কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর হয়ে গেল। কৃষ্ণদাস এবার সরে এসে লতার বালিসটায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল, লতার ভয়ে নয়, অতরাত্রে মাতার আবির্ভাব বিশেষ সুখের হবে না চিন্তা করে; সে শুয়ে পড়ার মুহূর্ত্তের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন বন্ধ হয়ে চুকচুক্ শব্দ শোনা গেল। মাতৃস্তন শিশুর মহৌষধই নয়, যাদুমন্ত্রও বটে।

দুজনের ভিতরে কিছুক্ষণ নিরাবিল স্তব্ধতা বিরাজ করল।

লতু—"

"কী—? আবার কি হ'ল।" লতা শিশুকে অন্য স্তনটি ধরিয়ে বলে।

"আমার আর একটা কথা রাখবে?"

"না রাখব না। এবার তুমি যা বলবে তা আমি বুঝতে পেরেছি, আর কথা দিচ্ছিনা—ও আমি মরে গেলেও পারব না। অমন যদি কর কাল

থেকে আমি অন্য ঘরে শোব বলে দিচ্ছি। আজই মা বলছিলেন দুতিন মাস আলাদা থাকতে খালি বাবার জন্য আসা হ'ল, তা জান?

"আমি কি বলব নাশুনেই একগলা লেকচার দিয়ে গেলে!"

"তুমি হাঁ করলেই আমি বুঝতে পারি—এক দুদিন ত আর ঘর করলাম না।"

"খুব বীর! কী বলব বলত।"

"যে জন্য এতক্ষণ জিদ্ করে বসেছিলে। আর ছেলেটার গলা শুকচ্ছিল, ঠিক বলেছি কিনা বলত?"

'হাঁ—একটু দাওনা দেখতে।" উত্তেজনায় কৃষ্ণদাস সেইস্থানেই উঠে বসল। লতা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল দিয়ে শিশুকে ঢেকে দিল।

"কখনো না। মরে গেলেও আমি তা পারব না। লজ্জায় আমি মরে যাব।"

"আচ্ছা—চাইনা আমি। কাল থেকে আমিই অন্যঘরে শোবার ব্যবস্থা করব।" কৃষ্ণদাস নিজের শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে, স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বুঝল তার অভিমান হয়েছে, কৃষ্ণদাস খুব অভিমানী সে জানে, এমন দৃশ্যের অবতারণা প্রায়ই হয়, এই জন্যই স্বামীকে তার এত ভাল লাগে, এ অভিমান লতারই পরাজয় আনে সর্ব্বদা, কিন্তু আজ এ ব্যাপারে সে ঠিক করল যে কিছুতেই হার মানবে না,—না—না মরে গেলেও স্বামীর এসাধ সে পূর্ণ করতে পারবে না।

জোর করে লতা চুপকরে থাকল, কখনও যা সে করে না। কিছুক্ষণ কৃষ্ণদাসের কোন সাড়া পাওয়া গেলনা—প্রায় অনেকক্ষণ!

"কী ঘুমলে নাকি—?" স্বামী কোন উত্তর দিলনা। "এই—রাগ করলে

নাকি ? এই—ই—” লতা কৃষ্ণদাসকে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিয়ে আবার ডাকল “এই—ই—”।

“উঁ—উঁ—” নিদ্রিতের মত কৃষ্ণদাস উত্তর দিল লতা মৃদু হাসল উত্তর শুনে।

“ঘুমওনি আমি জানি—তুমি রাগ করেছ। কিন্তু এ তোমার অন্যায় আবদার নয়—বলত ? আমাকে এমন লজ্জা দিয়ে তোমার লাভ কি হবে বলত ?” লতার কণ্ঠস্বর মিনতি-পূর্ণ।

“তোমার এ লজ্জার কোন মানে হয় বলত ? আমি ত আর পরপুরুষ নই !” কৃষ্ণ মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দেয়।

“পরপুরুষ এ কথা বললে তার এতক্ষণ একটি দাঁতও থাকত না। সে যাক—তোমার কাছে আমার কোন লজ্জাই ত রাখিনি—কিন্তু আজ তোমার একী অদ্ভুত সাধ !” পূর্ব্বে সমস্ত সাধ মিটাবার পূর্ব্বে লতা একথা বলেছে, পরে কিন্তু আত্মসমর্পণ করে খুসী হয়েছে, বাধা দেওয়াতেই হয়ত স্ত্রীর প্রধান আনন্দ। “কী ! রাগ গিয়েছে ত ?—এই, বলোনা।” বহুবার প্রশ্নেও কৃষ্ণদাস কোন উত্তর দিল না “বাবা !, কী ছেলে ! এমন জিদ কখনো দেখিনি—! আচ্ছা ওঠো, তোমার জিদই থাক। কই উঠলে ? এবার কিন্তু আমি রাগ করব বলে দিচ্ছি, কাল থেকে অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা করব কিন্তু বলে দিচ্ছি—কই উঠলে ? এক—দুই—” এবার কৃষ্ণদাস উঠে বসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল—।

“কী হার মানলে ত ?”

“আমার পালাই হল হার মানার, কি করব ?” লতা বলল। এতক্ষণ যে জিনিসকে কেন্দ্র করে' স্বামী স্ত্রীর মান অভিমানের পালা চলল সেটা অতীব সামান্য, বিশেষ স্ত্রীর পক্ষে, তার মধ্যে আধুনিক সভ্যতার

বিন্দুমাত্র লেশ নাই, আধুনিক স্বামী-স্ত্রী মুহূর্ত্তের জন্যও সমর্থন করবেন না, বোধ হয় ভিতরের আদি মানুষ ইচ্ছা করলেও সভ্যতা বাধা দেয়—এটা স্বাভাবিক কিনা নূতন স্বামী-স্ত্রীই বলতে পারবেন।

পরাজয় স্বীকার করে লতা স্বামীর সম্মুখে বসে শিশুকে দুধ দিতে লাগল প্রথমে আঁচল দিয়ে কিছু লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করল কৃষ্ণদাস আঁচল টান দিয়ে সরিয়ে দিতেই লতার দেহ অনাবৃত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ হ'য়ে গেল বন্ধ, মাথা গেল ঝুঁকে।

কৃষ্ণদাস লতাকে চুম্বন করল, গালে, কপালে, চুলে—এখানে, ওখানে, সেখানে—। লতার সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল।

শিশুকে শুইয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী শুল, কৃষ্ণদাস স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল।

"তুমি রাগ করনাই ত লতু ?"

"পাগল। কিন্তু তুমি একটা আস্ত পাগল।"

"সে ত তোমার জন্য।" স্বামীর এই পাগলামির জন্য লতা কত খুসী, তার কত গর্ব্ব তার ছেলেমানুষ স্বামীর জন্য ; লতা আধুনিক সভ্যতা পায় নাই।

সে রাত্রি দুজনে গল্প করেই কাটিয়ে দিল ; বহুদিন পর এমন হ'ল।

সংসারের কাজকর্ম্ম পুনরায় লতা ক্রমে নিজের বিভাগে আনতে লাগল যেমন যেমন তার শরীর ধীরে ধীরে সুস্থতর ও সবল হ'তে থাকল ; গ্রামের সুন্দর সংসারে পুত্রবধূর আগমনের পর কিংবা বালিকা পুত্রবধূ সংসারের যোগ্যা হবার পর শাশুড়ী ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ করে' সংসারের ভার ও দায়িত্ব নূতন গৃহিনীর উপর ন্যস্ত করে' শুধু স্বস্তি নয় আনন্দ অনুভবও করেন, যে দায়িত্ব তিনিও একদিন কম্পিত ও ভীত বক্ষে

গ্রহণ করে বহুদিন সুচারু রূপে পরিচালিত করে' এসেছেন সে গুরুভার পুত্রবধূর উপর ন্যস্ত করে' দৃষ্টির সম্মুখে সে দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখেন ও গর্ব্বে বুক ফুলে ওঠে। পুত্রবধূ পদার্পণ করেও এ গুরুভার গ্রহণ করে আনন্দে প্রতি পদক্ষেপে সাহায্য পায় শাশুড়ী বা কুমারী ননদের, প্রাথমিক ভুলত্রুটির সংশোধনের সাথে শাশুড়ীর নির্য্যাতন আসে না—ক্রমে ক্রমে বধূই সংসারে কর্ত্রী হয়, শ্বশুর ও শাশুড়ী স্নেহধন্য পুত্র ও কন্যার স্থান গ্রহণ করে; এমন সংসারে বিভাগীয় বহুধা-বিভক্তি নাই সংসার সুচালু থাকে সকলের সমবেত সেবায় ও চেষ্টায়।

লতা যখন এ সংসারে প্রথম আসে তখন সে নিতান্ত শিশু ছিল না, উপযুক্ত বয়েসে বিবাহ হওয়ায় এবং দরিদ্র পিত্রালয়ে সকল কাজের অভিজ্ঞতা থাকায়, প্রথমের দিকে স্বাভাবিক ভয় সত্বেও কয়েকদিনেই শ্বশুরের ক্ষুদ্র সংসারের সব ভার হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল, শশুড়ী মন্দিরের ব্যবস্থায়, গৃহদেবতার পূজার্চ্চনা, ভোগনৈবেদ্য প্রভৃতিতে তাঁর ষোলআনা মনোযোগ দিলেন, সংসারের ভার নিল পুত্রবধূ, অথচ দুজনের থাকল পারস্পরিক সহযোগিতা। লতা যে কয়দিন আতুড়ে ছিল সে কয়দিন শশুড়ী একা সংসারের সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন ক'রে পুত্রবধূর দিকে, তার স্বাস্থ্য, আতুড়ের ব্যবস্থা, শিশুর প্রাথমিক যত্ন ও আতুড়ে দাইএর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল, আতুড় থেকে বেরিয়ে আসার পরও কৃষ্ণদাসের মা পুত্রবধূকে বহুদিন কোন কঠিন কাজ করতে দেয় নাই, রন্ধনের ভার তখনও নিজেই রেখেছিলো।

মা, এবার রান্নাটা আমার হাতে দিন, দুমাস হল আমি বেরিয়েছি, আপনি কতদিন সামলাবেন ?" একদিন লতা শাশুড়ীকে বলল।

"আর কিছুদিন যাক না বৌমা—ঠাকুরের ভাবনা ত তুমিই ভাবছ,

এদিকটা আমি কিছুদিন চালাতে পারব, কষ্ট হলে আমি নিজেই বল
তোমাকে—" এ দুমাস লতা গৃহদেবতার সমস্ত ভার নিয়েছিল, প্রা
মন্দির পরিষ্কার করা, ফুল তুলে, চন্দন প্রভৃতি পূজার সমস্ত আয়োজ
ক'রে যথাসময়ে প্রতিদিনের পূজারী শ্বশুরকে দিয়ে পূজা করান, পূজা
সময় লতার কাজ ছিল ছেলে কোলে করে' শ্বশুরের পাশে বসে থাক
পূজার শেষে পূজারীর প্রথম কাজ হয়েছিল ঠাকুরের প্রথম পাদ্যঅর্ঘ্যে
একটি ফুল শিশুর মাথায় দেওয়া, পাদোদক তার জিহ্বায় স্পর্শ করা
নৈবেদ্য থেকে মিষ্টের কণিকা তুলে তার মুখে দেওয়া—শিশুর দুএকদিনে
ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল. কয়েকদিন পর থেকেই প্রসাদ খাবা
সময় হাসতে আরম্ভ করল, পরে অভ্যাস হ'ল ঠিক সেই সময়টা
পিতামহের হাত মুখের কাছে আসতেই সাপের মত দুচার বার জিব বে
করে' হাসা এবং কয়েকবার দ্রুত হাত পা আকাশে ছোড়া— !

প্রত্যহ তার কাণ্ড দেখে শ্বশুর পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে হাসত।

"বাবা, এ কিন্তু এর খুবই খারাপ অভ্যেস হচ্ছে, কিন্তু বড় হলে দেখবে
হামাগুড়ি দিয়ে এসে নিজেই খেতে আরম্ভ করবে। ভোগ দেবারও ত
সইবে না—" লতা একদিন বলেছিল।

"বৌমা—আমি ত সেইদিনের আশাতেই বেঁচে আ[illegible], সেই দিনই আমা
ঠাকুরের সত্যি ভোগ হবে…!" শ্বশুরের উত্তর শুনে লতা শিশুর গা
অঞ্চলের একটু মৃদু আঘাত করে বলল—

"শুনলি দাদু কি বললেন? দুষ্টু! বুঝলি ত?"

"হুঁ-উ—"শিশুর একটা অব্যক্তশব্দ তাদের দুজনের কাণে এইরূপ ব
প্রতীয়মান হল।

"শুনলে বৌমা—! শুনলে ত?"

পূজার পর রাধামাধব তৎক্ষণাৎ বৃত্তান্তটি বিস্তারিত বলল, তার স্ত্রীও কাহিনীটিকে অপূর্ব্ব মনে করে নাতিকে কোলে করে একবার আদর করল, দুএকদিন সে গল্পটি দুজনেই সকলকে বলল যার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হল, কয়েকজন শ্রোতা দুতিনবারও শুনল।

"কই বৌমা, আজ তুমি একা যে? দাদা কোথায়?" একদিন সকালে পূজায় বসে রাধামাধব লতাকে বলল।

"সে আজ ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা—"

"তা হ'ক নিয়ে এস। সে না আসলে আমি পূজোই করতে পারব না।"

"এর আগে কী করে করতেন বাবা—?" মৃদু হেসে লতা জিজ্ঞাসা করল।

"তখন আমার রাধামাধব এক ছিলেন, এখন দু' হয়েছেন, ওকে না আনলে ধ্যান করতে গিয়ে ওর মুখই মনে পড়বে যে!"

শিশুকে আনতে হল, তারপর থেকে এ রীতির ব্যতিক্রম কোন দিন হয় নাই।

প্রভাতী পূজার পর্ব্বের পর দ্বিপ্রহরে গৃহদেবতার ভোগ লতা রেঁধে দিত, তারপর সন্ধ্যায় আরতি ও ভোগ; আতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লতা একাজগুলো করত এবং সংসারের হাল্কা কাজগুলোও, প্রসবের পূর্ব্বে ব্যবস্থা ঠিক বিপরীত ছিল, তখন শাশুড়ী এই কাজগুলোর বিভাগে ছিল। দুমাস পরে লতা পুনরায় নিজের পুরাতন বিভাগে ফিরে যেতে চাইল শাশুড়ীকে গুরুতর কাজগুলো থেকে মুক্তি দেবার জন্য।

"এবার ত আমি ভালই হয়ে গেছি মা—ঠাকুরের কাজ! কোথায় ভুলটুল হয়ে যাবে, বড় ভয় করে আমার।"

"ভুল কেন হবে বৌমা! একদিন ত তোমাকে দুদিকেই সামাল দিতে হবে! আর ঠাকুরের কাজ মন দিয়ে ভক্তিভরে করলে ত্রুটি হলেও ঠাকুর

দোষ নেন না—ভক্তিভরে না করলে ভুল না হলেও ঠাকুর রাগ করেন—।” শাশুড়ী কথাগুলো বলে’ মন্দিরের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে প্রণাম করল।

ক্রমে আর দুমাস কেটে গেল, লতা এবার সংসারের ভার নিল, শাশুড়ী ফিরে গেল নিজের পুরাতন বিভাগে, ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হলেও প্রভাতে পূজার সময় ছেলেকে কোলে করে শ্বশুরের পাশে বসে থাকার দায়িত্বটুকু ঘুচল না ; একদিন কৃষ্ণদাসের মা বলেছিল—“ছেলে কোলে এখানে বসলে ওর ওদিকে কাজের বড় ক্ষতি হয় গো, শেষে হাঁই হাঁই কাজ ঠেলতে হয় বেচারাকে—আমি বরং ওকে কোলে নিয়ে বসব কাল থেকে।”

“তা হয় না গো ! মাতৃকোলে রাধামাধব ! তোমার কোলে যাবে কেন ও। এই ত একটুখানি সময়, এতে আর তোমাদের সংসার উলটিয়ে যাবে না—” অন্য ব্যবস্থা স্বামীর মনোপূত নয় দেখে স্ত্রী চুপ করল।

শিশুর বয়েস এখন প্রায় পাঁচ মাস হল।

সেদিন কৃষ্ণদাস ও রাধামাধব দুজনেই জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলার সদরে গিয়েছিল, আদালতপ্রাঙ্গনে বৈষয়িক কার্য্য শেষ করে রাধামাধব দেখলে যে আদালতপ্রাঙ্গনে প্রায় সমস্ত জিনিসেরই ছোটখাট সাময়িক দোকান বসেছে, যারা প্রত্যহই হাকিমের মত দশটা পাঁচটায় সেই আদালতে হাজিরা দেয়, দূরাদূর থেকে আগত মক্কেলরা বাড়ী ফিরবার সময় ক্রয় করে, রাধামাধবও বাড়ী ফিরবার সময় একটি ছোট দোকানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, দোকানদার নাতিদীর্ঘ একখানা সতরঞ্চির উপর কিছু ছোটখাট বাসন ইত্যাদি বিছিয়ে দিয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে শীর্ষে কতকগুলো পালকগুচ্ছ করা লম্বা একটা ছড়ি দিয়ে বাসনগুলোর উপর আঘাত করছিল, অভিপ্রায় হয়ত ঝাড়া।

"এই যে আসুন! কি চাই আপনার বাবু? দোকানদার রাধামাধবকে দেখে ঝাড়নটা দুবার জোরে আঘাত করে ফেলে উঠে দাড়াল; পিতার পশ্চাতে কৃষ্ণদাসও এসে দাঁড়াল।

"ঐ ছোট্ট থালা খানা দেখাবেন ত! রাধামাধব অদূরের একখানা কাঁসার ছোট থালাকে ইঙ্গিত করতেই দোকানী ক্ষিপ্রগতিতে সেখানা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—

"এই নিন—সুন্দর জিনিস। খাঁটি কাঁসা খাগরার—জলের দর!" রাধামাধব দোকানীর কথায় বিশেষ মন না দিয়ে থালা খানা দেখতে লাগল, সেখানা দেখতে সত্যই সুন্দর, কিনারা পদ্মকাটা, ভিতরে বাঙ্গালায় খোদাই করা কাছে 'স্নেহাশীষ', থালাটা রাধামাধবের বড় পছন্দ হল।

"এই থালার অনুপাতে একটা গেলাস ও একটা বাটি দিতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই, এই নিন—একেবারে এক শেটের!" ছোট্ট ছোট্ট একটি গ্লাস ও বাটি, দুইটিই কাঁসার, সুন্দর দেখতে, তিনটি দ্রব্য একসঙ্গে দেখে রাধামাধব মৃদু হাসল।

"খোকা দেখত কেমন দেখতে?" কৃষ্ণদাস এতক্ষণ পাশের দোকানের তেমনি ভাবে সাজান ছোট ছোট পোষাকগুলো দেখছিল। বড়দের গেঞ্জী, ছেলেমেয়ের প্যাণ্ট নানা রংএর, ছোট পেনি, বড় ও ছোট্ট মোজা, মেয়েদের বডিস্, চুলের ফিতা প্রভৃতি ছোট খাট আরও অনেক জিনিস, দেখছিল, পিতার ডাকে এ দোকানে ধ্যান দিল।

"এইগুলো? কিন্তু ঠাকুর ঘরের জন্য পিতলের নিলে হত বাবা।"

"ঠাকুরঘরের জন্য নয়, এ আমার দাদুর জন্য।" পুত্রের জন্য বলে কৃষ্ণদাস লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারল না; রাধামাধব মূল্য দিয়ে দিলেন।

"তুই এখানে একটু দাড়া খোকা, এগুলোও একটু ধর, আমি উকিল বাবুর

সঙ্গে একটু দেখা করে আসি—" পিতার প্রস্থানের পর কৃষ্ণদাস বাসন-গুলো হাতে করে পাশের দোকানের সামনে গিয়ে দুটো জিনিস তুলে নিল।

'এদুটোর দাম কত?"

"ঐ দুটো—? একটাকা চার আনা—!" দোকানী বলল। কৃষ্ণদাস দ্বিরুক্তি না করে জিনিস দুটো পকেটে ফেলল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পিতাপুত্রে বাড়ী ফিরল।

বাড়ীতে পৌঁছে রাধামাধব সন্ধ্যা পূজার সমাপ্তি পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রাখতে পারল না, স্ত্রীকে ডেকে পুত্রবধুকে সামনে বসিয়ে বাসনগুলো খুলে সম্মুখে রেখে নিজেও ছেলেমানুষের মত বসে পড়ল।

"এই দেখ গো—এই দেখ বৌমা, কী এনেছি দেখ!"

"ওমা! তোমার বুদ্ধি কি দিন দিন লোপ পাচ্ছে নাকি?" কৃষ্ণদাসের মা বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল।

"কেন—?"

"ঠাকুরের জন্য এই কাঁসার বাসন আনলে? পেতলের লাগে তাও ভুলে গেলে আদালতে গিয়ে? আর তাছাড়া বাসন ত অনেক আছে!"

"গিন্নী, আমার বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে কিন্তু তোমার বুদ্ধি একেবারেই নেই—লোপ পাবারও কোন ভয় নেই। তুমি বলত বৌমা কী জন্য এনেছি—?" পুত্রবধূর দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টি দিলেন।

"বলব? আমার জলখাবার খাওয়ার জন্য এনেছেন বাবা; তাই না?" ছোট্ট শিশুর সুরে লতা শ্বশুরকে বলল, চোখে তার মৃদু হাসি।

'ইঃ, আমার ভারী দায় পড়েছে আমার বুড়ো মার জন্য আনতে, এ বাসন

এনেছি আমার বুড়ো দাদার জন্যে—!" রাধামাধব কথা বলে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো।

"ওমা তাই নাকি ? বাঃ সুন্দর হয়েছে গো, খাসা হয়েছে।" রাধামাধবের স্ত্রী এবার বাসনগুলোর প্রত্যেকখানা বার বার হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। বাসনের মালিকের নাম শুনে লতা এবার কোন উত্তর দিল না। "দাদা আমার এতে ভাত, এতে জল, এতে ডাল, এতে দুধ খাবে—বাবু কম নয়, বাবুর পুরো বাসন আছে—এ কিন্তু আমি ওকে দেব, বুঝলে—?"

"বাঃ, কিনে আনলাম আমি আর দাতা হবেন উনি—!" কৃত্রিম রোষে রাধামাধব স্ত্রীকে বলল।

"ওঃ, ভারি কিন্নেবালা !—আমি তোমাকে দাম দিয়ে দেব। বলত এক্ষুনি এনে দিচ্ছি—দেব ?"

"না, তাহবে না—দাম থাকে তুমি কিনে আনাও না কেন ? খোকাকে পাঠিয়ে কাল আনিয়ে নাও। এ আমি দেব ওকে ভাতের সময়।"

"ও হবে না—আনাতে হয় তুমিই আনিয়ে নিও—এটা আমার পছন্দ হয়েছে—" উত্তরের ভরসা না করে রাধামাধবের স্ত্রী সেগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল—। লতা বুড়োবুড়ির ঝগড়া দেখে তখন মৃদু মৃদু হাসছিল।

"দেখলে মা, দেখলে ত ওঁর কাণ্ডখানা ? এটা অবিচার কিনা তুমিই বল—" রাধামাধব যেন বিচারকের কাছে অভিযোগ জানাল।

"কিন্তু আপনি মার কাছে হেরে গেলেন বাবা—"

"জীবনভরে ঐরকম হেরেই এলাম আমি মা—"এমন সময় স্ত্রী জিনিস গুলো রেখে এসে সামনে দাঁড়াতেই রাধামাধব কথার মাঝখানে বিরতি টানল।

"আচ্ছা বাবা, এখনই ওর বাসন আনলেন, ভাত খেতে যে ওঁর এখনও অনেক দেরী—" হেসে লতা জানাল।

"কিছু দেরি নেই, বসতে শিখলেই ওকে আমি খাওয়াব আমার কাছে বসিয়ে—একটু সবুর কর বাপু। ওগো দেখ, দাদুর জন্যে একটা পিড়ি করে রাখতে হয় কি বল—?"

শেষের কথাগুলো স্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

'নিশ্চয়ই, একটা পিড়ি না করলে দাদু খাবে কিসে বসে—?" স্ত্রী সমর্থন করল; লতা অকস্মাৎ স্বামীকে আসতে দেখে মাথার ঘোমটা টেনে দিল অনেকটা, তার ঘোমটা টানা দেখে রাধামাধব মুখ তুলে দেখেন কৃষ্ণদাস অদূর দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকছে।

"খোকা—!" পিতার ডাকে সে দাঁড়াল—"কাল একবার নসু ছুতোরকে খবর দিস ত, নয়ত সকালে গিয়ে তুইই ডেকে আনিস—বলিস খুব দরকারী কাজ আছে—।"

রাত্রে লতা যখন শুতে এল তার ঘরে কৃষ্ণদাস তখন জেগেই ছিল, লতা ঘরে ঢুকে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে মশারি ফেলে চারিদিকে সেটাকে গুঁজে দিল।

"একী তুমি এখনও শোওনি? সারাদিন খেটেখুটে এখন আবার কী পড়তে লাগলে?" কৃষ্ণদাস চেয়ারটায় বসে টেবিলের উপর একখানা বই রেখে পড়ছিল, লতা তার চেয়ারের হাতলটা ধরে বলে' তার উপরই বসে পড়ল। বই একখানা কৃষ্ণদাস পড়ছিল বটে কিন্তু তার পৃষ্ঠার লেখার মধ্যে তার মন একটুও ছিল না। মন ছিল বিক্ষিপ্ত, কান ছিল দুয়ারের দিকে উৎকর্ণ। সারাদিন খেটেখুটে সত্যিই যাতে সে ঘুমিয়ে না পড়ে সেইজন্যই বইখানা সামনে করে' বসা।

"কী বই ওখানা—?" বইখানার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে সে বাঁ হাত দিয়ে কৃষ্ণদাসের গলাটা জড়িয়ে ধরল।

"কিছু না, একখানা 'গল্পের বই—" সেও বইখানা বন্ধ করে' ডান হাত দিয়ে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে উত্তর দিল।

"শুয়ে পড়লে না কেন?"

"ঘুমিয়ে পড়ার ভয়ে—!"

"ওমা! সেকি কথা, ঘুমবার জন্যেই ত লোকে শোয়—" একটু হেসে লতা স্বামীর সম্মুখের টেবিলের এককোণে বসে পড়ল।

"আজ সহর থেকে একটা জিনিস এনেছি লতু, সেটা তোমাকে দেখাব বলে' ঘুমইনি—বলত কি জিনিষ—?"

"ওমা! তাই নাকি? তুমিও জিনিস এনেছ! বাবা ত আনলেন নাতির জন্যে বাসন, আর তুমি?—বলব? তুমি ঠিক সেই নাতির মায়ের জন্যে একখানা খু-ব ভাল শাড়ী এনেছ? বল ঠিক বলেছি কি না?" লতা টেবিলটার উপর ভালভাবে চেপে বসল।

"পারলে না—সাড়ী ত সেই দিনই সহর থেকে এনে দিলাম। আজ কী আনা যায়? বাবা আজ সঙ্গে ছিলেন যে!"

"তবে আর বলতে পারলাম না। যা হ'ক, যা এনেছ শিগ্‌গির দেখিয়ে ফেল বাবু, আর আর তর সইছে না—" এবার লতা উঠে দাঁড়াল। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস সহর থেকে সুন্দর একখানা সাড়ী এনে দিয়েছিল, সেদিন সে একা গিয়েছিল সহরে, সেদিনও রাত্রে এইভাবে লুকিয়ে সে স্ত্রীকে সাড়ীখানা দিয়েছিল, লতাকে সেই সাড়ীতে চমৎকার মানিয়েছিল, বাস্তবিক সুন্দরী নারী প্রথম সন্তানের পর সুন্দরতর হয়, যৌবনে চাকচিক্য আসে, চঞ্চলতা অপেক্ষাকৃত সুস্থির হ'য়ে সুন্দর হয়। লতা সে সাড়ী বাহিরে পরতে পারে নাই, অন্যকে দেখাতেও পারে নাই। 'কে এনে দিল সাড়ী' কোথা থেকে পেল সাড়ীখানা' প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর

সে মারা গেলেও দিতে পারত না, সুতরাং সাড়ীখানা তার বাক্সে আশ্রয় পেয়েছে, কয়েকদিন মাত্র রাত্রে সেখানা পরে স্বামীকে দেখিয়েছিল তার অনুরোধে। স্বামীর আনা জিনিসের তার কাছে এই দশাই পেয়েছে। গ্রামে শ্বশুর বা শাশুড়ী ছাড়া স্বামীর কাছে কোন উপহার প্রকাশ্যে বা গোপনে নেওয়াও লজ্জার ?

কৃষ্ণদাস উঠে তার নিজের বাক্স খুলে একটা জিনিস এনে স্ত্রীর হাতে দিল, লতা সেটাকে হাতে করে চোখের সম্মুখে নানা ভঙ্গিতে দেখে বলল—"বাঃ—চমৎকার হয়েছে ত, সুন্দর মানাবে—কী-ই সুন্দর— !" লতা জিনিসটিকে বার বার দেখল, ছোট্ট শিশুর মত সে যেন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতে চাইল ; দ্রব্যটি অতীব সামান্য. একটা ছোট লাল প্যাণ্ট, কৃষ্ণদাস তার শিশুপুত্রের জন্য গোপনে কিনে এনেছিল, লাল টুকটুকে সাধারণ কাপড়ের প্যাণ্ট, কোমরে ইলাষ্টিক রবার দেওয়া, পরাবার জন্য ফিতে দিয়ে বাঁধতে হবে না। এ পদ্ধতিটুকু লতার বড় পছন্দ হল—দেখ এটা পরাতে ফিতে লাগবে না, কী মজা না ? ওকে বরাবর এই রকম প্যাণ্টই এনে দিও। ও বড় হলেও এই রকম প্যাণ্ট পরাব, ফিতে খুলতে পারবে না, নয়ত দেখ ওর প্যাণ্টের ফিতে পরিয়ে আমি ফুরসৎই পাব না,—যা দুষ্টু হয়েছে এখনই !" এক নিঃশ্বাসে লতা কথাগুলো বলে গেল।

"তাই দেব আমিও ভেবেছি। বড় বড়ও আছে দেখলাম।" কৃষ্ণদাস এতক্ষণে কথা বলবার অবসর পেল।

"কিন্তু একটা কথা ! এতক্ষণ ত আমি ভাবিইনি, প্যাণ্ট ত আনলে কিন্তু ওকে পরাব কি করে' ?" লতার দুচোখে বিস্ময়।

"কেন ? এ পরান ত খুবই সহজ—এটা পরাতে পারবে না ? না পার আমি দেখিয়ে দেব কাল।"

"তুমি ভীষণ বোকা ! আমি সে পরাবার কথা বলছিনে, কাল সকালে সবার সামনে কী করে' বের করব ? মা যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি কী বলব ?"

"কেন ? ব'ল যে আমি এনে দিয়েছি।"

"তা আমি পারব না। মরে গেলেও না, আমার ভীষণ লজ্জা করবে—না —না, সে কিছুতেই না—" লতা প্যাণ্টটা নিজের আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল।

"সত্য তুমি কী ? একী তোমার সাড়ী যে লজ্জা ! তোমাকে ত যা এনে দিয়েছি সব বাক্স পচা করছ। এটার যদি ঐ অবস্থা কর তবে জীবনেও তোমার সঙ্গে কথা বলব না, সব তাতেই বাড়াবাড়ি--!" কথার সুরে বুঝা গেল যে কৃষ্ণদাসের রাগ হয়েছে। আঘাতটা কোথায় লেগেছে তার লতা বুঝতে পারল, সে স্বামীর কাছে এসে তার একখানা হাত ধরে বিনীত সুরে বলল—

"তুমি রাগ ক'র না লক্ষিটি। সত্যিই বল আমার লজ্জা করে না এতে ? তুমিই বুঝে দেখ।"

"এত আর তোমার জন্যে সাড়ী ব্লাউস্ বা সৌখিন কিছু আনিনি, ছেলের জন্যে, তাও সামান্য একটা প্যাণ্ট ! এতেও লজ্জা—?"

"এতে যদি লজ্জা না থাকে তবে তুমি বা এনে মার হাতে দিলে না কেন ? এত আর আমার সাড়ী নয়, তবে লুকিয়ে রেখে রাত্রে আমাকে দেখালে কেন ?" লতার কথাটায় যুক্তি আছে এবং যুক্তিটা বুঝেই কৃষ্ণদাস যেন আরো দুঃখিত হল।

"বেশ, দরকার নেই ওকে পরিয়ে, প্যাণ্টটা আমাকে দাও, কাল ওটাকে পুড়িয়ে ফেলব—দাও—।"

বালাই ষাট্! ওকী কথার ছিরি—! ওর নাম করে এনেছ সে জিনিস তুমি পোড়াবে? ও কথা তুমি মুখে আনলে কি করে!" মাতা সত্যই চমকে উঠল। কথাটা এতক্ষণে কৃষ্ণদাসকে সচেতন করল, সেও যেন একটু চমকে উঠল।

"আনলাম একটা জিনিস সখ করে;—না পরাও না পরাবে।" কৃষ্ণদাস এসে চেয়ারে বসে পড়ল, স্বামী যে কতখানি আশা করে জিনিসটি এনেছে সেটা লতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারল, এই গোপনীয়তা সে সখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেছে তাও বুঝতে পারল, তার সখটা পূর্ণ না করলে স্বামী যে এবার সত্যই মর্ম্মাহত হবে সেটা লতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরে এগিয়ে গেল স্বামীর কাছে।

তুমি একটা ভয়া—নক বোকা! সত্যিই ভাবলে নাকি যে এটাকেও আমি বাক্সে পুরবো—এটা আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমিই লজ্জার মাথা খেয়ে—আরে দূর এতে লজ্জারই বা কী আছে? এতক্ষণ তোমাকে রাগাচ্ছিলাম, বেশ লাগে তুমি রাগলে।" লতা স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরল। "এখনই একবার [illegible] না পরিয়ে কেমন দেখায়—আমার সকাল পর্য্যন্তও তর সইছে না [illegible] ওগো দেখব—?"

"না—না, এখন না, [illegible] উঠলেই কাঁদতে সুরু করবে, সে কাঁদুটে ছেলে তোমার।" কৃষ্ণদাস তরল হ'য়ে বল্লে।

"তাই বই কি! হুঁ—" লতা স্বামীকে চুম্বন করে আবহাওয়াকে তরলতম করবার চেষ্টা করে। "চল এবার শোবে চল। এটা বাইরেই

থাক।” যতো লজ্জাই হোক স্বামীর এ সাধটুকু পূর্ণ লতা করবেই, সে ভাবল।

“দাঁড়াও—আর একটা জিনিস আছে—!”

“আবার কী? ছেলের দেখছি জিনিসে আজ ধুল পরিমাণ, বাবা, তুমি দুজনে মিলে আজ দেখছি বাজার উজাড় করেছ—দুটো একসঙ্গে দেখালে না কেন? তুমি বড় টুক্‌রো করতে ভালবাস, আমার বাবু তর সয় না—আর একটা কী জিনিস দেখি! ঐ বাক্সেই আছে ত? আচ্ছা আমিই দেখছি, ইচ্ছে হচ্ছে খোকণকে এখনি টেনে তুলে সব পরিয়ে একবার দেখি।” প্রস্থানোদ্যম লতার হাত ধরে তার গতিকে কৃষ্ণদাস রুদ্ধ করল।

“উঁ—হু!—তুমি না গো, এটা আমি দেখাচ্ছি—বলত কি?”

“খোকনের জামা নিশ্চয়ই—তাই বলি শুধু প্যাণ্ট আনবে—”

“না, এটা খোকনের মার জন্যে—এবার বল কী।” “আমার জন্যে? নিশ্চয়ই সুন্দর একখানা সাড়ী! আমার কিন্তু মনে মনে খুব রাগ হচ্ছিল যে এখন আর আমার জন্যে আনবে কেন, এখন তোমার অন্য লোক হয়েছে—দেখি না গো কেমন সাড়ী? তুমি আমাকে বড় হাঁপ ধরাও—কই—” লতা স্বামীর হাত ধরে বাক্সের দিকে টানতে লাগল।

“সাড়ী নয়গো—সাড়ী দিয়ে তোমাকে কী হবে? এতবার এনে দিলাম সব বাক্স পচা করছ, আমার এনে দেওয়া সাড়ী তুমি পরবে কি করে! লজ্জা—লজ্জা—! সাড়ী আর তোমার জন্যে আনব না। এবার অন্য জিনিস এনেছি—আমার অনেক দিনের সখ—লোকেও দেখতে পাবে না—!” কৃষ্ণদাস যেন কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করেই দ্রব্যটি বাক্স থেকে বের করে’ নিয়ে এল; দ্রব্যটি নারীর উত্তর দেহের অন্তর্বাস অর্থাৎ

আধুনিকারা যাকে বলেন 'টাইট্‌ব্রেষ্ট ; শব্দটি শুনতে, বলতে বা লিখতে অশ্লীল শোনায় অথচ এ যুগে সেটা বোধ হয় বেশভূষার জন্য অপরিহার্য্য ; গ্রামে ও দ্রব্যটি চলন কম, একেবারে নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না, প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য যাদের সাহায্য করে তাদের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে দৈহিক রেখা জাগ্রত রাখার প্রয়োজন নাই, কৃত্রিমতা একটা দেহের আবেষ্টন দিতে পারে, মনের মিথ্যা সখ মিটাতে পারে, প্রকৃত দান দিতে পারে না। কৃষ্ণদাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও আধুনিকতার মৃদুহাওয়া, সুলভ উপন্যাসের সাহায্যে বহুদিন পূর্ব্বেই এ সখটা তার মনের গ্রাম্য বদ্ধ আবহাওয়ায় কয়েকটি মৃদু তরঙ্গ তুলেছিল লতার ঔদাসিন্যে, লতার অনাধুনিক মনোভাবাপন্নতায় সে তরঙ্গ বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে নাই, তবুও মাঝে মাঝে একটা কুরোগের মত কৃষ্ণদাসকে বিদ্ধ করে কিন্তু তবুও এ অগ্রগতিটুকু তার আজ শুধু প্রথম নয়, অসীম সাহসিকতার পরিচয় ; কৃষ্ণদাস অন্যান্য স্বল্পদোষাপন্ন সখগুলি চরিতার্থ করবার চেষ্টা আংশিক সফল হয়েছিল, অধিকাংশ চেষ্টায় লতার মৃদু অথচ দৃঢ় তিরস্কারে প্রতিহত হয়েছে। গণ্ডগ্রামে সামান্য সেমিজ পরা শুধু অননুমোদিত ছিল তা নয়, সেটা নাকি কুলবধূকে ভ্রষ্টা বলেও ইঙ্গিত করত, আজকাল সোনাপুরে সে আবহাওয়া না থাকলেও মেয়েদের জন্য যৌবনের একটা সীমা নির্ব্বাচিত করে সেমিজ পরবার অনুমতি প্রচলিত ছিল চল্লিশোত্তরে সেটা ক্রমে দেহ থেকে খসে যেত ; তবে আজকাল সোনাপুরের মেয়েরা দূরে অদূরে সহরে বিবাহিতা হওয়া এবং সোনাপুরের যুবকেরাও সহরে মেয়েকে কোন কোন ঘরে কুলবধূ করে' বরণ করায় যৌবনোন্মুখ কুমারীরা তাদের ছায়ায় বিশ্রাম করে' 'ব্লাউস্' এর চলন হয়েছে, প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ, আলোচনা নিষ্কাসন করলেও এখন সেটা প্রচলি

হয়ে গেছে; লতা যখন প্রথম সোনাপুরে বধূরূপে পদার্পণ করে তখন ব্লাউসের প্রচলন হয় নাই বললেই হয়, যদিও সেদিন খুব অতীতের কথা নয়; বধূরা তখন হাতে ও গলায় লেস্‌ দেওয়া রঙ্গীন সেমিজই পরত, লতাও তার বেশী অগ্রসর হয় নাই হবার শিক্ষা বা ইচ্ছাও তার মনে ছিল না; এখন সর্ব্বদা সেমিজ পরলেও কোথাও যেতে আসতে ব্লাউস্‌ পরত, কৃষ্ণদাসের এ সখটি সফল হ'তে রাগ, অভিমান, খোসামদ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে অবশেষে শাশুড়ীর অনুমোদনের ইঙ্গিৎ পেয়ে সে প্রথম যেদিন ব্লাউস পরে' বেড়াতে যায় সেদিন লতা লজ্জায় ও ভয়ে ঘেমে উঠেছিল—এখন জিনিসটা ধাতস্থ হয়েছে—গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বামীর সখ লতা অনেকগুলি সফল করেছিল, কতক পারে নাই, কতক কৃষ্ণদাস বলতেই সাহস পায় নাই।

আজ কৃষ্ণদাসের ঘাড়ে যেন ভূত চেপেছিল। গাঢ় রক্তবর্ণের দ্রব্যটি খুব মূল্যবান নয়, সাধারণ সচরাচর ফেরিওয়ালাদের কাছে এ জাতীয় পাওয়া যায়, রংএর পছন্দ হিসাবেও কৃষ্ণদাস যে পরিচয় দিয়েছে সেটা আধুনিকারা অনুমোদন করবেন না জানি, কৃষ্ণদাস অতটা উচ্চ আধুনিকতায় পৌঁছবার সাহস রাখে না, জানতও না, পুত্রের দেহকান্তির দিকে দৃষ্টি রেখে লাল প্যান্ট ক্রয় করেছিল, সেই রুচিতেই স্ত্রীর অনুপম দেহকান্তির দিকে দৃষ্টি রেখে এই দ্রব্যটি কিনে ফেলেছিল, তার পুরাতন পদ্ধতি উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গে গাঢ় রক্তবর্ণের সামঞ্জস্য অতুলনীয় মনে করেছিল নিজের কল্পনার বুকে; ও দুটি বর্ণের মিলন সুন্দর হলেও সকল ক্ষেত্রে মধুর বা রুচিসঙ্গত নয় কৃষ্ণদাস ভাবতে পারে নাই। নূতন পদ্ধতিতে সহজে পরবার জন্য দ্রব্যটির ইলাষ্টিক ফিতা ও আকৃতি ছিল।

লতা স্বামীর হাত থেকে জিনিসটি নিজের হাতে নিল, সেটার ওপর একবার মাত্র দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—"তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে গো! ভূতে পায়নি ত?"

"কেন?" কৃষ্ণদাস এমন উগ্র অভিমত আশা করে নাই। "কেন? ভূতে না পেলে লোকে এই জিনিস আনে?"

"লোকেই ত এগুলো পরে।"

"ভদ্রলোকে নয়—!" লতার কঠিন কণ্ঠস্বর।

"একথাটা তুমি রাগ করে বললেও অন্যায় বলতে লতা, যদি কোন ভদ্র নারী এ জিনিস ব্যবহার করে তবে তাদের তুমি অপমান করলে—এটা অন্যায় নয় শুধু—এটা পাপ।" কৃষ্ণদাস জিনিসটি দূরে ফেলে দিয়ে চেয়ারে এসে বসল। লতা নির্ব্বাক দাঁড়িয়ে থাকল, বুঝল যে তার উক্তি অন্যায় হয়েছে, স্বামী এ প্রকারের উক্তিকে ঘৃণা করেন—লতাও সেই শিক্ষা পেয়েছে তার কাছে। কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে স্বামীর কাঁধ ধরে দাঁড়াল, অতীব মৃদু ও দোষীর সুরে বলল—"ও রকম কথা আর আমি বলব না, তুমি আমায় মাপ করো হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বল আমায় তুমি মাপ করেছ? বলনা গো—" স্বামীর চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরল নিজের দৃষ্টির পথে, এগিয়ে গেল তার সম্মুখে।

"এ শিক্ষা ত তোমায় আমি দিই নাই লতু—" কৃষ্ণদাস স্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনায় অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।

"তা জানি—হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আচ্ছা তুমি বল ওটা আমি কী করে পরি—ও পরে কোথাও বের হওয়া যায়? মা কী বলবেন? লোকেই বা কী বলবে—?"

"শুধু ওটাইত আর পরে যাবে না—ওর ওপরে ত জামা থাকবে—কে দেখতে যাচ্ছে ওটা— !"

জামা থাকলেও বোঝা যাবে ওপর থেকে ; তোমরা না বুঝলেও মেয়েরা ঠিক ধরে ফেলবে ; তা ছাড়া যা টকটকে রং ওটার, সাতটা জামা ফুড়ে রং বের হবে ওর—আর মা ত কোনদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, তার মনে ব্যথা লাগবে, তিনি ও সব পছন্দ করেন না, তোমার ওপর নেহাৎ বিনা কারণে একটা খারাপ ধারণা হবে—তোমার এত সখ আমি রেখেছি, আমার একথাটা তুমি রাখ, লক্ষিটি গো, তোমার পায়ে পড়ি—" শেষের কথাগুলোর সুরে মনে হল যেন লতা কত বড় একটা বিপদে পড়েছে।

"আমার সখ যদি তুমি না পূর্ণ করবে তবে আর কে করবে লতু, আমি কী নিয়ে জীবন ধারণ করব—?" বেশী অভিমান হলে কৃষ্ণদাস নভেল-প্রাপ্ত দুএকটা শুদ্ধ শব্দ নিজের কথায় ব্যবহার করে ফেলত, কথার ছাঁচটাও নাটকীয় হত। এ উক্তি গ্রাম্যবধূ লতার অন্তরকে আঘাত করল, সে যেন পরাজয় স্বীকার করল।

"আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, ওটাকে তুমি বাইরে পরে যেতে ব'ল না, রাত্রে তোমার সামনে পরব, যেদিন বল, যদি রোজ বল রোজই পরব—তুমি যত এনে দেবে কোনদিন আপত্তি করব না—।" নূতন বেশটি পরতে লতারও কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য ছিল না তা নয়, নারীর পক্ষে এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সনাতনী ; দেশ কাল পাত্র এবং আবহাওয়া সেটাকে পঙ্গু করে' স্তিমিত করে' রাখে মাত্র।

"এইত লক্ষী মেয়ের মত কথা। এই কথাটা প্রথমে বললেই সব গোল চুকে যেত , আমি কী বলেছি যে তুমি এটা পরে শুধু পাড়ায় একবার

চক্কর দিয়ে এস—আজই, এক্ষুণি পর।" কৃষ্ণদাস দ্রব্যটিকে কুড়িয়ে এ
স্ত্রীর সম্মুখে দাড়িয়ে বল্লে—"এস আমি পরিয়ে দিই—"
'আঃ—দাড়াও! আগে জামাটা খুলি—না-না আমিই খুলছি—"
এবার কৃপা করে আপনারা ওঘর থেকে চলে আসুন, শীলতা
কৌলিন্যর দাবী সেটা।

সোনাপুরে জ্যৈষ্ঠ এল তার শ্রেষ্ঠতা সঙ্গে করে, আমের স্তবকে স্তবকে
কাঁঠালের তৈল-চিক্কণ পাতার ছন্দে, মাঠভরা শস্যের শীর্ষে, সোনাপুরে
আবহাওয়া তার নতুনত্ব জ্ঞাপন করে দিল, সে আবহাওয়ার স্পর্শ যোগা
চাসীপুরুষের শীতসঙ্কুচিত প্রাণে, মাঠের পর মাঠ, শস্যের দিকে মু
দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার প্রাণে যে ছবিতে রং ধরল তার প্রতিবিম্ব পড়ল ঘ
যুবতী স্ত্রীর পূর্ণ অন্তরে, গ্রামের নতুন মৃদু হাওয়া জানিয়ে দি
সোনামুখীকে তার আগমনী পরিপূর্ণতাকে, খুসীতে সে চক্ চক্ ক
উঠল, ফলিত গাছের দিকে তাকিয়ে শিশু কিশোরের দল যেন গৃহছাড়
হ'ল, বৃদ্ধারা, প্রৌঢ়ারা আমসত্ত্বের ছাঁচ বের করে' তৈলচিক্কণ কর
রৌদ্রে দিল, যুবতীরা ফলের রসে রসবতী হ'ল, অন্তঃসত্ত্বা সদ্য বিবাহিতার
লুকিয়ে ঝালনুন তৈরী করে দুপুরে গোপন বৈঠকের পুনরধিবেশ
করল।

সোনাপুর শীতের বুড়তা থেকে মুক্ত হ'য়ে মুখর হ'ল।

বাংলায় জ্যৈষ্ঠের গ্রাম যে কত মধুর আপনি সহরে থেকে কিংবা আধুনিক
নগরীর গগনচুম্বী প্রাসাদের কপোত-কোটরে বাস করে' নিম্নে ফেরিওলা
'ল্যাংড়া আ-য়া-ম—"চিৎকার শুনে বিন্দুমাত্র উপলব্ধি কর
পারবেন না।

শিশু বিবেকের পাঁচ মাস বয়েস হয়েছে, তার চোখ মুখ নাক ফুটে উ

নিজের নিজের রেখাগুলো 'পরিস্ফুট করে' সৌন্দর্য্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, জন্মের পরেই শিশু মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়, তখন তার বর্ণ কিংবা দেহসৌষ্ঠব সঠিক বুঝা যায় না ; প্রথমে কৃষ্ণদাসের পুত্রকে দেখে, রাধামাধবের পৌত্রকে দেখে সোনাপুরের পুরুষ ও মেয়ে প্রশংসা করেছে, এখন পাঁচ মাসের বিবেককে দেখে তারা মুগ্ধ হ'ল, শিশুর মাতা সুন্দরী কিন্তু তার এ সৌন্দর্য্য যেন কাহারো সৌন্দর্য্যের উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত নয়, এ রূপ যেন ঋণের সুদ নয়। রাধামাধব তাকে প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তে দেখে ক্রমশঃ অধিক আকৃষ্ট হ'তে লাগল, সে নিজের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিচ্ছবি দেখে, নিজের ভবিষ্যত রক্তধারার উজ্জ্বল প্রবাহ দেখে প্রথমে আনন্দিত হয়েছিল, স্বপ্ন দেখত সোনাপুরে তার দরিদ্র কুটিরের চির-স্থিতি, মানশ্চক্ষুতে পরিষ্কার দেখত গৃহদেবতার মন্দির-চূড়া স্বর্ণপতাকা, অনুমান করত গৃহপ্রাঙ্গনে শস্যগোলার স্থানাভাব—আর এখন সে যেন সেই সঙ্গে শিশুর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। রাধামাধবের স্ত্রী নারী—সে তার আনন্দের ভাষা দিতে পারে না, অসংলগ্ন কথা বলে, গ্রামের লোকে বলে— "ছেলেটা যেন সৃষ্টিছাড়া রূপ নিয়ে জন্মেছে—রাধামাধবের পূজো সার্থক হ'ল, নিশ্চয়ই দেবতার অংশে জন্ম নয় ত এই রূপ হয়—!"

"তোমার রূপকেও ছাড়িয়ে গেছে বিবেক! তোমার গর্ব্ব কমল ত এবার—?" কৃষ্ণদাস লতাকে বলে।

"আমার রূপকে ছাড়াক আপত্তি নেই—কিন্তু তোমার গুণগুলো যেন পায় —মার বাবার আশীর্ব্বাদ যেন পায় এই আমার প্রার্থনা—আমার রূপের গর্ব্ব নেই কিন্তু ওগুলোর গর্ব্ব আছে—বিবেক যেন বংশের নাম রাখতে পারে—" লতার উত্তর স্বামীকে স্তব্ধ করে দিত।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই ঈশ্বর আছেন অসংখ্যরূপে, সাকার রূপে কিংবা

নিরাকাররূপে ; হিন্দুর কোটি কোটি দেবদেবী আছে, তাঁদের ম
বয়সের পার্থক্য আছে, রূপের, দৈহিক গঠনের, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অচিন্তনী
তারতম্য আছে, শুধু তাই নয় তাঁদের শক্তির শ্রেণীবিভাগ আছে
কর্ম্মবিভাগের সীমারেখা টেনে দিয়ে প্রত্যেককে ভিন্ন কার্য্যের দপ্ত
দেওয়া আছে ; আপনি বলবেন আপ্তবাণীর অজস্র প্রচার, বেদ উপনিষদ
প্রভৃতির অজস্র ঘোষণা—যদিও সেগুলো জানি না, ক্ষুদ্র বুদ্ধিশক্তির দৌড়
ততদূর পৌঁছতে পারে না তবুও এইটুকু হয়ত ঠিক যে তাঁদের দেবতার
জন্যও একটা কিছু আকৃতি সাকার বা নিরাকার, একটা কিছু শক্তি ঠিক
করা হয়েছিল—সে মীমাংসা সমাধান করবার উদ্দেশ্য আমার নয়,
দর্শনশাস্ত্রের, ভগবৎ-তত্ত্বের গূঢ়তম ও সূক্ষ্মতম আলোচনা করার শক্তি
আমার নাই—তবে সাধারণ হিন্দু হিসাবে আমার সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে
দেব দেবী বলতেই যে সব আকৃতি ভেসে ওঠে তাঁরা সকলেই সুন্দর সুন্দরী—
ভক্ত হ'ক, ঋষি হ'ক, সাধারণ মানুষ হ'ক কিংবা অবতারই হ'ক—
দেবতাকে যিনিই আকৃতি দান করে থাকুন তিনি যে প্রতি দেব দেবীকেই
একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য দিয়ে মূর্ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা পরিষ্কার
মনে হয় ; সেই জন্যই বোধ হয় সুন্দর বলতেই দেবতাকে বুঝি, পবিত্র
বলতেই দেবতাকে বুঝি, শক্তির আধারকে বলতেই দেবতাকে তুলনায়
টেনে আনি।

আমি কখনও দেবতা দেখি নাই—যদিও বিশ্বাস করি, অন্য কেহ
দেবতা দেখেছেন কিনা জানি না, তবুও এক এক সময় মনে হয় যে
আমি যদি সেই পুণ্য সময়ে জন্মগ্রহণ করতাম তখন দেবতার কোন রূপ
দান হয় নাই তিনি শুধু জ্যোতির্ম্ময় ছিলেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য যদি সেই

জ্যোতির্ম্ময়কে খণ্ড খণ্ড করে রূপ দান করার প্রয়োজন হত তবে আমি কোন দেবতাকে পূর্ণবয়স্ক নরনারীর রূপ দিতাম না।

আমার দেবতার রূপ হ'ত—একটি শিশু পাঁচ ছয় মাসের, যার জাতি নাই, পুরুষ নারী রূঢ় পার্থক্য নাই, অপূর্ব্ব সুন্দর অসহায় সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন দুরন্ত এক শিশু!

আপনি অনুমান করুন এমনই একটি ছবিকে—পাঁচ মাসের একটি শিশু মুক্ত আকাশের তলে শুয়ে আছে, সুদূর শূন্যের দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত তার বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাত পা ছুড়ছে, আকাশটাকে নিজের মুঠোর ভিতরে আকর্ষণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সমগ্র সৃষ্টির দিকে ক্রমাগত নিজের অবোধ্য ভাষায় শাসন চালিয়ে যাচ্ছে, চতুর্দ্দিকে সকলে তার দিকে তাকিয়ে আছে—তাদের দৃষ্টিতে আছে করুণা, মোহ, ঔৎসুক্য, সেবাগ্রহতা, ভীতি, অসহায় শিশু পৃথিবীর সমগ্র শক্তিকে আকর্ষণ করে রেখেছে নিজের ভিতরে, বাস্তব পৃথিবীর কিছু বুঝে না অর্থাৎ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তার নিজের নখদর্পণে অথচ তার নিজের কোন কিছুর অর্থ লোকে বুঝতে পারে না, সুতরাং নিজের মনের মত অর্থ করে সুখী হয়—!

দেবতার যদি এই রূপ ও মূর্ত্তি হ'ত আমি সী হতাম, আপনিও হতেন নিশ্চয়। যশোদা কর্ত্তৃক রজ্জুবদ্ধ দুরন্ত বালক-কৃষ্ণকে দেবতা বলেই মনে হয় কিন্তু কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে পার্থ-সারথিকে মনে করলেই একজন কূটবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা বলে ভক্তি হয় না বরং ভয় হয়।

বিবেক সেই প্রকার শিশু-দেবতা।

সকাল হ'লেই লতা শিশুকে তেল মাখিয়ে বারান্দায় রৌদ্রে শুইয়ে রেখে সংসারের কাজে নিজকে ডুবিয়ে দেয়; তার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে তার

নিজের খাটে নির্ব্বিবাদে শুয়ে থাকে; রাধামাধব নাতির জন্য নমু ছুতোরকে দিয়ে ছোট একখানা খাট প্রস্তুত করিয়েছিল, খাটখানার পায়া ভূমি থেকে বেশ কিছু উঁচু রাখার উপযুক্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই হাত, প্রস্থে প্রায় হাত দুয়েক এবং তার চতুর্দ্দিকে উঁচু রেলিং দ্বারা বেষ্টিত যাতে বিবেক দাঁড়াতে শিখলেও তাকে অনায়াসে তার মধ্যে বন্দী করে রাখা চলে, টপ্‌কে পড়ে যাবার বিন্দুমাত্র ভয় নাই। শিশুকে মশামাছির উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ভাল নেটের মশারির ব্যবস্থা করা হয়েছে; মশারি টাঙ্গিয়ে সকাল বেলায় বিবেককে তার ভিতরে শুইয়ে রৌদ্রে রাখা হয়, মাথাটা থাকে ছায়ায়, প্রচুর সরিষা-তৈল-সিক্ত দেহ থাকে রৌদ্রে—রৌদ্রের তেজ বাড়লে খাটখানা সম্পূর্ণ ছায়ায় টেনে আনা হয়; অতিরিক্ত তেল মাখিয়ে রৌদ্রে রাখলে শিশুর দেহ বর্ণ খারাপ হয় বলে যাঁরা ধারণা পোষণ করেন তারা খুবই ভুল করেন, এ ব্যবস্থায় শিশুর দেহ শুধু সুস্থ সবলই হয় না, দেহকান্তি উজ্জ্বলও হয়। বিবেকের বার্ণিশ-চিক্কণ খাট, দুগ্ধফেননিভ নেটের মশারি, রবারক্লথের উপর কারু-কার্য্য সমন্বিত কাঁথা, সুন্দর ছিটের সরিষার বালিশ; পুষ্ট সবল বিবেক শয্যায় শু'য়ে মশারি থেকে বিলম্বিত লাল সোলার ফুলটার দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত তার হাত পা ছুড়ে চলেছে এবং মুখে অনর্গল দুর্ব্বোধ্য ভাষা বলে চলেছে।

প্রতি প্রভাতের নিয়মিত ব্যবস্থা। বাড়ীতে লতা সংসারের কাজে ব্যস্ত, শাশুড়ী মন্দিরের প্রভাতী পূজার ব্যবস্থায় আত্ম-সমাহিত, কৃষ্ণদাস গরু, গোলা, শস্য ও ক্ষেতের ব্যবস্থায় বিব্রত—স্থির শুধু ঐ চঞ্চল শিশু এবং তার পাশে একখানা জল চৌকির উপবিষ্ট বৃদ্ধ-শিশু রাধামাধব—সে এক দৃষ্টিতে শিশুর দিকে তাকিয়ে অদূরের গড়াড়ার নলটা হাতের মুঠার মধ্যে

ক'রে ক্রমাগত ধোঁয়া মিলিয়ে দিচ্ছেন আকাশের দিকে এবং সেই সঙ্গে যুক্ত করে যাচ্ছেন নিজের চিন্তারাশি—দুটোই নির্গত হ'য়ে সুদূর আকাশে পরস্পরের লঘুত্ব নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা করছে। মাঝে মাঝে শিশু অকারণে হেসে উঠলে রাধামাধবও সেই সঙ্গে হেসে উঠছে, মুখের নল হাতে শ্লথ হ'য়ে পড়েছে—, শিশু কখনও কেঁদে উঠছে অকারণে তখন রাধামাধব ব্যস্ত হ'য়ে ডাকে— "বৌমা—ও বৌমা—আহা, দাদু বড় কাঁদছে—" লতা যেখানে থাক, যত দরকারী কাজেই বিব্রত থাক ছুটে তাকে আসতে হবেই, নতুবা রাধামাধব অনর্থ করে।

"ছেলে বড় পাজি হয়েছে—কাজ করতে ও দেবে না। বাবা—ও দু-একবার কাঁদলেই আমাকে টেনে আনেন—ওদিকের কাজের দেরী হ'য়ে যায় যে! কেঁদে আপনিই থেমে যাবে—" লতা প্রায়ই বলে।

"সে হবে না বাপু! ওর কান্না আমি সহ্য করতে পারিনে—হোক দেরী তোমার কাজে—কতক্ষণ লাগেই বা ওকে থামাতে—!"

এ রকম প্রায়ই হয়।

"বাবা—! বেলা হ'য়ে গেছে অনেক আপনি স্নান করে আসুন, ওদিকে পূজোর দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—মার সব গোছান হ'য়ে গেছে—" লতা এসে শ্বশুরকে বলে, রাধামাধব তখন নিয়ম মত জলচৌকির বসে শিশুর ক্রীড়া তন্ময় হ'য়ে দেখছে। পুত্রবধূর দ্বিতীয় ডাকে তার তন্ময়তা ভাঙ্গে—!

"বাবা—!"

"ওঃ—কী বৌমা?"

"আপনার স্নানের সব ঠিক করে দিয়েছি—পূজোর দেরী হচ্ছে!"

"ওঃ—দেখ বৌমা দাদু ঐ ফুলটাকে দুহাত দিয়ে ধরবার চেষ্টা করছে দেখ, পারছে না বলে কী যেন বলছে, বোধ হয় রেগে যাচ্ছে, ওর রাগ

ঠিক আমার মত হবে দেখো—আমার খুব রাগ ছিল—জিজ্ঞেস ক'রো তোমার শ্বাশুড়ীকে—”

“আমি ত আপনার একটুও রাগ দেখিনি বাবা—এই এত বছরে—লতা মৃদু হেসে শ্বশুরকে বলে।

“পাগলি! তোমার ওপর রাগ করব কী দুঃখে—! বুঝলে বৌমা, দাদু আমার দুচার দিনেই উপুড় হ'তে শিখবে দেখ—ঐ—ঐ—দেখ কাৎ হবার চেষ্টা করছে—উপুড় হ'ল বলে—দেখ! উপুড় হ'তে শিখলে প্রথম প্রথম খুব নজর রাখতে হ'বে, কিছুক্ষণ পরেই চিৎ করে দিতে হবে, নয়ত বুকে চাপ পড়বে—প্রথম প্রথম কিনা—।”

“আপনার দেরী হচ্ছে বাবা—!” লতা প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করে কারণ ও প্রসঙ্গে রাধামাধব অনেকক্ষণ কাটাতে পারে সে ভয় লতার আছে।

“ওঃ—! হ্যাঁ চলো চান করতে যাই—না বৌমা তুমি এখানে থাক যতক্ষণ আমি চান করে না আসি—।” রাধামাধব নলটি গড়গড়ার দেহে জড়িয়ে রেখে উঠে দাড়ায়।

“আমার কাজ আছে বাবা—ও থাকনা খাটে, বেশত আছে, পড়বার ত আর ভয় নেই—”

“না বৌমা, তুমি বোঝ না, ছেলেপিলেকে একা রাখতে নেই, কুকুর, বেড়াল —নানারকম খারাপ হাওয়া বাতাস আছে—তুমি ওর কাছে থাক—আমি এলাম বলে।” কুদৃষ্টি ও খারাপ হাওয়া বাতাসের কুফল থেকে রক্ষা করবার জন্য শিশুর কোমরে কালসূতায় গ্রথিত তামার পাই পয়সা হুঁকার কাঠি, মাদুলি প্রভৃতি কয়েকটা তুক্‌তাকের দ্রব্যে রীতিমত একটা মালার সৃষ্টি হয়েছে, গলায় লাল সূতায় একটি প্রবাল ও মাদুলি এব

কপালের এক পাশে কাজলের বড় একটি ফোঁটাও আছে কুদৃষ্টিকে খণ্ডন করবার জন্য, গ্রামে এখনও এগুলো প্রচলিত।

অনন্যোপায় হ'য়ে লতাকে শিশুর কাছে থাকতেই হয়, তারপর পূজার সময় তাকে কোলে ক'রে শ্বশুরের সম্মুখে বসবার রীতি পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎই আছে।

পূজা শেষ হ'লে রাধামাধব পট্টবস্ত্র ত্যাগ করে, সাধারণ বস্ত্র পরে' খালি গায়ে খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে সে আবার বারান্দায় সেই জলচৌকির উপরে বসে, লতা বিবেককে এনে তার নিজের খাটে শুইয়ে দেয়, শ্বশুরের গড়গড়ার উপর নতুন একটি কল্‌কেয় আগুন ধরিয়ে নলটি তার হাত দিয়ে মৃদু হেসে বলে—"বাবা, এবার দুভাইয়ে চুপ্ ক'রে' বসে থাকুন দেখি আমাকে আর বিরক্ত করবেন না, এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে—"

"ও বাবা! এ যে কড়া হুকুম! আর যদি আমরা দুই ভাই এক সঙ্গে তোমাকে ডাকতে আরম্ভ করি তা'লে কী করবে শুনি—?" রাধামাধব শিশুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন সে শিশুর কাছ থেকে একটা সমর্থন আশা করছিল—শিশু বলে ওঠে—"হুঁ-উ—" এবং নিজে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লতাকে দেখিয়েই নিজের মুখে পুরে' দেয়—" ঐ দেখ, দেখলে বৌমা, দাদুর আমার পুঁরো মত আছে—তোমাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দিল—কীই বা করতে পার তুমি—?"

"বিরক্ত করেই দেখ না, এসে দুজনকেই বকুনি দেব—কাউকে আদর করব না একটুকুও—" লতা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে।

"বটে! চলরে দাদু, আমরা বৈঠকখানার বারান্দায় যাই—এমন মার কাছে চাই না থাকতে—ক্ষিদে পেলে দুজনেই চেঁচাব, দেখি মা কেমন

চুপ করে থাকতে পারে—!" রাধামাধব নলটি গড়গড়ার গায়ে জড়িয়ে রেখে বিবেককে বুকে তুলে বৈঠকখানার বারান্দায় চলে যান, লতা হেসে নিজের কাজে মন দেয়।

বৈঠকখানার বারান্দায়ও একখানা জলচৌকির উপর রাধামাধব বসে বিবেককে কোলে ক'রে, শিশু পিতামহের কোলে বসে ক্রমাগত হাত-পা ছোড়ে, কখনও দুহাত দিয়ে রাধমাধবের হাঁটুর ওপর মৃদু অথচ দ্রুত চপেটাঘাত করে, মুখে অনর্গল কি যেন সব বলে যায়, তাতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে দাদুর মুখের দিকে তাকায় নিজের ঘাড়টা বেঁকিয়ে, মুখে বলে—

"আম্—উম্—বাঃ—"

রাধামাধব বিজ্ঞের মত তার কথার উত্তরে বলে— "হ্যাঁ, দাদু, ঠিক বলেছ—মাকে খুব ঠকিয়েছি—!"

"হু—ব—" অর্থাৎ খুব। বিবেক উত্তর দেয়। তারপর তার নিজের অবিরাম বক্তৃতা ও হাতপা ছোড়া ক্রমাগত চলতে থাকল, রাধামাধবও তার সঙ্গে নির্ব্বিবাদে কথা বলে চলেছে, পাশের ঘর থেকে শুধু শুনলে মনে হবে যেন রাধামাধব কোন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে চলেছে।

বৈঠকখানার বারান্দাটি নাতিদীর্ঘ, উত্তরমুখী, পশ্চিমের দিকে বাঁশের সুন্দর জাফ্‌রি করে বন্ধ করা, তার গায়ে একটি সবুজলতা তুলে দেওয়া হয়েছে, সেটাতে কাঞ্চন বর্ণের একপ্রকার ফুল স্তবকে স্তবকে ফুটে আছে, পশ্চিমের দিকে বারান্দার বাইরে কয়েকটা বেলফুলের গাছ, পূর্ব্বদিকে কোন আবরণ নাই, প্রভাতের রৌদ্র এসে সমস্ত বারান্দাটাকে ধৌত করে, পশ্চাতের দ্বার দিয়ে ভিতরে অর্থাৎ বৈঠকখানায় যাবার পর, সম্মুখে নাতিদীর্ঘ তিন ধাপের একটি সিড়ি, সেটি পাকা, বারান্দার মেজটি মাটির

অথচ পরিষ্কার ভাবে নেপিয়ে তকৃতকে রাখা হয়েছে, সম্মুখে মাথার উপরে কাঠের ঝিলমিলি দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বারান্দাটিকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বারান্দার সম্মুখে যে ছোট পথটি অদূরে গেট পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে তার দুধারে দেশী ফুলের গাছ, পথটি কাঁচা; তবে পথের দুধারে ইট কোণা করে পোতা হয়েছে এবং দুপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে বেলফুলের গাছ, গেটটি ছোট, তাতে কাঠের ছোট্ট ফটক লাগান। বাড়ীর সম্মুখটুকু বাঁশের জাফ্রি বেড়া দিয়ে বাগানটিকে গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

এই বারান্দায় রাধামাধব প্রায় প্রতি সকালেই বিবেককে কোলে ক'রে বসে থাকে।

"কী রাধামাধবদা, নাতি কোলে করে বসে কী হচ্ছে—?" পথে যেতে যেতে নবীন দাস অহেতুক জিজ্ঞাসা করে!

"এই ভাই বসে আছি দুজনে—তুমি কোথায় চলেছ—?"

"আর বলোনা দাদা—ছেলেটার আবার জ্বর হয়েছে কাল রাতে, যাই কবরেজদার কাছে একটু ওষুধ নিয়ে আসি—"

"আহা আবার জ্বর হয়েছে! খুব বেশী জ্বর নয় ত?"

"না এখন বেশী নেই, রাতে খুব কাঁপুনি দিয়ে এসেছিল—"—নবীন একটু দাড়িয়ে কথাগুলো বল্লে।

"ম্যালেরিয়া তা'হলে—আচ্ছা যাও তুমি, ওবেলা গিয়ে একবার দেখে আসব—।" নবীনদাস ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গেছে। রাধামাধবের একখানা হাত অজ্ঞাতভাবে শিশুর কপাল স্পর্শ করে, হয়ত তার দেহ উত্তাপ দেখবার জন্যই। সম্মুখের পথে যাতায়াত করতে করতে তার সঙ্গে এমনই কত লোকের কথাবর্ত্তা হয়ে যায়, কখনও বা

কেউ তারই সঙ্গে গল্প করবার জন্য ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, কেউ বা বারান্দার উপর খাটে বসে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে যায়।

"কী হে রাধামাধব! খুব যে ছুটিতে বসে গল্প গুজব হচ্ছে, বলি ছুটি জুঠেছ বেশ—!" হেসে হারাণ চাটুয্যে ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে' বারান্দার দিকে আসতে আসতে বল্লে।

"আসুন চাটুয্যে দাদা—প্রাতপেন্নাম হই—! এই দুই ভাইএ বসে সুখ দুঃখের কথা, বলছি—" ততক্ষণে চাটুয্যে মশায় বারান্দায় উঠে পড়েছেন, রাধামাধব নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, দুহাতে শিশুকে ধরে ছিল বলে মাথাটা ঈষৎ ঝুকিয়ে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে নিজে প্রাতঃপ্রণাম জানাল, এটা তার স্বভাবগত ব্রাহ্মণ কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠর সঙ্গে দিনে প্রথমবার দেখা হ'লেই তার উদ্দেশ্যে রাধামাধব নিজের ভক্তি ও শ্রদ্ধাটুকু জানিয়ে দেয়। চাটুয্যে মশায় জলচৌকির উপর বসেন—জুড়িটি বেশ জুঠেছে—!" দ্বিরুক্তি করে তিনি নিজের রসিকতায় হাসতে থাকেন।

"তা ঠিক দাদা—এখন দুজনেই অথব্য, নিষ্কর্ম্মা, তাই এক সঙ্গে বসে সময় কাটাচ্ছি—একটু তামাক ইচ্ছে করবেন ত?"

"তা করাও—" এ ইচ্ছায় তিনি অনিচ্ছা কখনও আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। বারান্দার পশ্চিমে কিছু দূরে একটা গোলার কাছে একজন চাকর দুতিনজন লোককে কী যেন মেপে দিচ্ছিল, জাফ্‌রির ভিতর দিয়ে সে দৃশ্যের কতকাংশ দেখা যাচ্ছিল রাধামাধব ডাকলেন—"ওরে ওখানে কে আছিসরে—?

"এজে—আমি—রঘুনাথ—" ভৃত্য রঘুনাথ নিজের উপস্থিতি জানায়।

"ওঃ—রঘো, একটু ইদিকে আয় বাবা—, হ্যাঁ দেখ্‌ রঘো ঠাকুরদের হুঁকোটায় জল ফিরিয়ে এক ছিলিম ভাল ক'রে তামাক এনে দে দেখি—"

ঠাকুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য পৃথক হুঁকায় তামাক আনবার আদেশ দিয়ে রাধামাধব বারান্দার কোণের কাঠের টুলটার উপর বসে, তামাকের ধোঁয়া বা গন্ধ থেকে শিশুকে যথাসাধ্য দূরে রাখা রাধামাধবের স্বভাব। তামাক আসে, চাটুয্যে ঠাকুর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ধূম উদ্গীরণ করতে করতে কথার রেশটুকু টেনে চলেন মাত্র, বিবিধ ও বিভিন্ন প্রকারের সূত্রহীন কথাবার্ত্তার পর চাটুয্যে মশায় দ্রুত দুচারবার হুঁকোতে টান দিয়ে ঠোঁটদুটি বিকৃত করে বলেন—"না—কিছু নেই, পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, রঘো ব্যাটা বোধ হয় ঠিকরেটা দেয়নি—"

"ওটা পালটে দেবে দাদা—?" রাধামাধব ব্যস্ত হ'য়ে বলে। 'না! থাক, বেলাও হ'ল—এবার উঠি—!" তিনি উঠে হুঁকোটা কাঠের খোপের উপর বশিয়ে কথাগুলো বলেন। "তোমার নাতি ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে গো—শুইয়ে দাওগে, ঘুমন্ত ছেলে কোলে রাখতে নেই—বেশ হয়েছে, খাসা ছেলে হয়েছে, দিব্যি সুস্থ সবল ছেলে, যেন রাজপুত্তুর!" চাটুয্যে মশায় যাবার সময় অহেতুক কথাগুলো বলেন যা শুনে রাধামাধবের প্রাণটার ভিতরে খচ্ করে ওঠে, সে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে ডাকে—

"বৌমা—ও বৌমা—আঃ, কোথায় থাক সব।"

লতা তাড়াতাড়ি ছুটে আসে, নিদ্রিত পুত্রকে দেখে কতকটা শান্ত হয়—

"ও ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ভাবলাম বুঝি আপনার কোলে—" তার কথাগুলোর প্রতি বিন্দুমাত্র ধ্যান না দিয়ে রাধামাধব বলে—

"তুমি ওর বাঁহাতের কঁড়ে আঙ্গুল একটু কামড়ে ওর মাথায় তোমার বাঁ পায়ের একটু ধূলো দিয়ে দাও—"

"কেন আবার কী হ'ল—?"

"চাচুয্যে দাদার নজরটা বোধ হয় লাগল, তাও আবার ঘুমন্ত অবস্থায়! কই দাও—আঃ—" রাধামাধব এবার যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তই হ'য়ে ওঠে।

"আপনি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিন তবে ত! আপনার কোলে থাকতে আমার পায়ের ধূলো ওর গায়ে কেমন করে দেব!" শ্বশুর ছেলে তার খাটে শুইয়ে দেবার পর লতা রাধামাধবের কথা মত কাজ করে, দিনের মধ্যে বহুবার এ কার্য্য তাকে করতে হয় শ্বশুর ও শাশুড়ীর নির্দ্দেশে।

আপনার কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন বাবা, খোকন যে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছে—আপনি বুঝতে পারেন নি ?"

"পেরেছিলাম, ঘুমভাঙ্গবে বলে ওকে তুলিনি—"

"দাড়ান আপনার কাপড় এনে দিচ্ছি—"

"থাক্—থাক্—দাদুর ইয়েতে কোন দোষ নেই, ও ত আমার গঙ্গাজল—!" তার সঙ্গে লতাও হাসে। "ওর খাটটা বরং আমার ঘরে করে দাও—এখানে বড় রদ্দুরের ঝাঁঝ!" বিবেকের খাটের পায়ায় ছোট ছোট চাকা ছিল, লতা সেটাকে চালিয়ে শ্বশুরের ঘরে দিয়ে দিল।

রাধামাধব এবার বেশ ভাল ভাবে একবার তামাক পান করবার জন্য গড়গড়াটির দিকে মন দিল, লতা পুনরায় নিজের আ[illegible] ফিরে গেল। প্রায় প্রতি প্রভাতেরই এই প্রকার কাহিনী!

দ্বিপ্রহরে রাধামাধব আহারে বসে যখন তখন লতার কাজ হ'ল পাখ হাতে করে' শ্বশুরের সম্মুখে বসে বাতাস করা, কী শীত কী গ্রীষ্ম এ কর্ত্তব তার ধারাবাহিক, এখন সেটা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে' স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, বিবাহের পর থেকে কর্ত্তব্য জ্ঞানে আরদ্ধ পদ্ধতি এখন স্বভাব এবং এর ব্যতিক্রম শুধু রাধামাধব নয় লতারও ভাল লাগে না এই সময় শাশুড়ী পরিবেশনের ভার নিয়ে পুত্রবধুকে এই কর্ত্তব্যটুকু

শিখিয়েছিলেন, এখনও সেটা চলছে, পূর্ব্বে নিজে যে কাজটুকু করে' আনন্দ পেতেন পুত্রবধূকে শিখিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন। সচরাচর বাড়ী ফিরিতে কৃষ্ণদাসের দেরী হয়, যে দিন সে আগেই ফিরে আসে সে দিন পিতার সঙ্গেই আহারে বসে, অন্যান্য দিন লতা শ্বশুরকে গল্প শুনিয়ে, কথাবার্ত্তা বলে ছেলেমানুষের মত খাওয়ায়, কিছু পড়ে থাকলে সে অভিমান ক'রে বলে—

"বারে, ওটুকু খেয়ে ফেলুন বাবা—!"

"আর পারছিনে মা—আকণ্ঠ হ'য়ে গেছে—!"

"সে হবে না বাবা, আমি এত কষ্ট করে' রাঁধলাম, আপনি ওটা খেতে ভাল বাসেন বলে—আর তা'লে কোনদিন রাঁধব না কিন্তু।

"পেটটা ফাটাবে নাকি মা?" শ্বশুর হেসে বলে।

"ওটুকুতে কিছু হবে না—খেয়ে ওঠার পর আমি খুব ভাল করে' তামাক সেজে দেব।" আহারে পর লতার এ কর্ত্তব্যটুকু দৈনন্দিন, অন্য সময়ে রাধামাধব নিজে ও কার্য্যটুকু করে, কিন্তু আহারের পরই সে গিয়ে শুয়ে পড়ে শয্যায়, লতা সুন্দর ভাবে তামাক সেজে, শিয়রের কাছে গড়গড়াটি রেখে নলটি শ্বশুরের হাতে দেয়, রাধামাধব মৃদু টান দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ে, ক্ষেত খামারের কাজ মাঠে গিয়ে যতদিন নিজে দেখা ছেড়ে দিয়েছে অর্থাৎ সে ভারটুকু যোগ্য পুত্র নেবার পর থেকে রাধামাধব এই বাদ্‌শাহী আরামটুকু উপভোগ করছে—ও কলকেটি লতা সেজে না দিলে রাধামাধবের ভালই লাগে না, তাই তার এই প্রলোভন দেখান।

"এত করে' বলছে বেচারী, খেয়েই ফেল না বাপু! বলে—উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে—" লতার শাশুড়ী পুত্রবধূকে অনুমোদন করে বলে। এই রকম প্রায়ই হয়।

যে দিন কৃষ্ণদাস পিতার আহারের পূর্ব্বে আসে সেদিন সে পিতার সঙ্গেই আহারে বসে, এটাও রাধামাধবের ইচ্ছা, এবং সেই জন্য সেই ব্যবস্থাই চলে আসছে, কৃষ্ণদাস যে দিন পিতার সঙ্গে আহারে বসে সে দিন লতা পাখা নিয়ে শ্বশুরের পাশে বসে তবে আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে জড়সড় হ'য়ে এবং সেদিন কোন কথাবার্ত্তাও হয় না ; শুধু গ্রামের নয় সহরেও এখনও শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলা বা তাঁদের সঙ্গেই কথা বলা রুচিবিরুদ্ধ বলে গণ্য হয়।

বিবেকের জন্মের পর আজকাল এ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে, এখনও লতা যথারীতি পাখা নিয়ে শ্বশুরের কাছে বসে কিন্তু পুত্রকে কোলে নিয়ে বসতে হয়, আহারের সঙ্গে সঙ্গে রাধামাধব, তার স্ত্রী, ও লতা বিবেকের সঙ্গে কথা বলে, শিশু নিজের ইচ্ছামত অনর্গল দুর্ব্বোধ্য ভাষায় উত্তর দিয়ে যায় এবং অবিরাম নিজে হাত পা ছুড়ে চলে।

"আঃ—খোকন তুমি বড় দুষ্টুমি করছ, পা লাগিয়ে দাদুর খাওয়া নষ্ট করবে নাকি ? বাবা, কাল থেকে ওখে রেখে আসব আপনার খাওয়ার সময়, কবে আপনার খাওয়া পালাগিয়ে নষ্ট করবে—!" লতা একদিন বলেছিল।

"ও কথাটি মুখে এন না বৌমা, ওর পা লাগলে আমার খাওয়া নষ্ট হবে না, আর কিছু দিন অপেক্ষা কর ওর মুখে ভাত হবে, বসতে শিখুখ, তোমাদের কোন প্রয়োজনই হবে না—" রাধামাধব কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে—"বৌমা, দাদু আমার খেতে শিখবে, আমরা তিন পুরুষ একসঙ্গে বসে খাব—আমি সেই শুভদিনের আশাতেই বেঁচে আছি বৌমা—!" শেষেরদিকে রাধামাধবের গলা ভারী হ'য়ে যায়।

আহারের পর রাধামাধব যথারীতি শয্যা গ্রহণ করে, লতাও যথারীতি

তামাকটি সেজে শ্বশুরের হাতে নলটি ধরিয়ে দেয়, সেই সময় বিবেকের খাটও রাধামাধবের খাটের পাশে আসে, গল্প করতে করতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। লতা সংসারের কাজে ডুবে যায়।

গ্রামে মেয়েরা দুপুরে ঘুমায় না, ঘুমবার অবসরও পায় না, ক্বচিৎ কদাচিৎ অবসর হ'লে গ্রামের কোন বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে যায়।

সন্ধ্যার পূজারতির পর রাধামাধব নিজের ঘরে বিশ্রাম করে, সে সময়ও বিবেক দাদুর সঙ্গেই থাকে যতক্ষণ না লতা সংসারের কাজ শেষ করে নিজের ঘরে শুতে যায়।

পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে শিশু বিবেক ধীরে ধীরে বড় হ'তে থাকে; তার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হ'ল; এখন বিবেক বসতে শিখেছে ভাল ভাবে, হামাগুড়ি দিতে পারে ক্ষিপ্র গতিতে, বসে বসে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামা করে, পূজার সময় এখন লতা তাকে কোলে করে বসে না, এখন সে নিজেই মন্দিরের সিড়ির ধাপগুলো অনায়াসে অতিক্রম করে' দাদুর আগেই তাঁর আসনের পাশে নিজের নির্দ্দিষ্ট ছোট আসনে বসে থাকে, পূজার সময় বিরক্ত করে, দাদুকে অনুকরণ করে' তার সম্মুখে পাত্র থেকে ফুলে তুলে ঠাকুরের দিকে ছুড়ে ফেলে দেয়, ঠাকুর পর্য্যন্ত সে ফুল না পৌছুলে (এবং সেটা মূর্ত্তি থেকে বহু দূরেই থাকে) রাধামাধব নিজে সে ফুল তুলে ঠাকুরের পায়ে দেয়। দাদু চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে, শিশু কিছুদিন ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করল, কী ভাবল সে জানে আর মন্দিরের দেবতাই জানেন, তারপর থেকে দাদুর সে অবস্থা হ'লেই বিবেক দাদুর কাপড় ধরে কিংবা যুক্ত করের আঙ্গুল ধরে টানাটানি আরম্ভ করত এবং অবিরাম দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে যেত। রাধামাধব চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলত—

"কী দাদু? তুমিও বস জোড়াসন করে'—য়্যা!—এই ভাবে, হুঁ
আর এই ভাবে তুমিও চোখ বন্ধ করে' ঠাকুরের ধ্যান করো—
রাধামাধব শিশুকে জোড়াসন করে' বসার ভঙ্গিতে তার পা দুটো তদনুরূ
করে বসিয়ে দিয়ে হাতদুটো কোলের উপর যুক্ত করে' দিয়ে চোখ ব
করবার জন্য চোখের উপরের পাতা দুটি নিজের আঙ্গুল দিয়ে নামিে
বলত। বিবেক তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিজের মূর্ত্তিতে ফিরে আসত; লত
বিচারক হ'ত, বলত—" বাবা, কাল থেকে ওকে আর আনব ন
আপনাকেও বিরক্ত করে, ওদিকে আমার রাজ্যির কাজ পড়ে থাকে—
আগে যেন কোলের ওপর চুপ করে' পড়ে থাকত, এখন কী আর সে
ছেলে আছে! রাজ্যের সেরা দুষ্টু হয়েছে—"
"তোমার কোন কথা মানব না বৌমা, ও না থাকলে আমার পুজোই হ
না। তুমি শুধু একটু সামলে রাখ, আর কিছুদিন পরে, আর একটু ব
হ'ক তখন দেখ ও চুপ করে বসে থাকবে, আমার সঙ্গে ধ্যানও করে
তখন যত পার সংসারের কাজ ক'রো—!" শ্বশুরের কথা শুনে লং
দ্বিরুক্তি করে না, ছেলেকে পাশে বসিয়ে সামলে রাখে, রাধামাধব তা
হাতে একটা ফুল দিয়ে বলে—"এইটে তুমি নাও দাদু—তুমি পুে
করো—" বিবেক ফুলটি হাতে নেয়, ডান হাতের দুটি ছোট আঙ্গুল দি
তার পাপড়িগুলো ছিড়ে নিজের পায়ে দেয়, লতার প্রাণটা চমকে উে
রাধামাধব পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে পুনরায় ধ্যানে বসে।
তিন পুরুষ একসঙ্গে বসে আহার করবার আশা রাধামাধবের পূর্ণ হয়েছে
পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক বিবেক এখন রীতিমত খেতে শিখেছে তার দাদ
সঙ্গে বসে, খাবার সময় যে দৃশ্য উপস্থিত তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেও
আবশ্যক। রাধামাধবের আসনের পার্শ্বে বিবেকের ভিন্ন আসন পা

রীতিমত, তার ভিন্ন পিঁড়ি, ভিন্ন থালা, বাটি এবং গেলাসে জল প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে চাই, কোনটার ত্রুটি থাকলে বিবেকের চেয়ে রাধামাধবের বিরক্তি বেশী প্রকাশ পায়। লতার উপর আদেশ হয়েছে যে শ্বশুরকে ভাত দিবার পূর্ব্বে বিবেকের থালা তার সম্মুখে দিতে হবে, প্রথমে দু একদিন শ্বশুরকে প্রথমে দেওয়ায় শিশু ভয়ানক চীৎকার করে কী যেন বলেছিল—

"আঃ বৌমা, তোমরা গুরুজন বুঝে আদর করতে জান না, ইনি হলেন বিবেকবাবু, আমার বড়দাদা—প্রথমে এঁকে দেবে তারপরে আমি—দেখ বাবু ভয়ানক চটেছেন—তোমাদের খুব অন্যায় বাপু!" হেসে রাধামাধব লতাকে বলে—"দাদু আজকের মত আমাকে মাপ করে দাও ভাই, এ ভুল আর হবে না, মাকে আমি খুব বকে দিয়েছি—আজকের মত খাও, উঠে যেও না, লক্ষ্মি দাদু আমার!" রাধামাধব তার হাত ধরে পিঁড়িতে বসিয়ে দেয়, লতা তাড়াতাড়ি তার সামনে ভাত এনে দেয়। পরদিন থেকে ভিন্ন ব্যবস্থা হয় এবং সেই ব্যবস্থা আজও চলে আসছে। বিবেকের থালায় অতি অল্প চারটি ভাত, সমস্ত তরকারী দিব্য ভদ্রভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়, নুনটুকু দিতেও ভুল হয় না, একটু করে লেবুও দেওয়া হয়, ছোট্ট বাটিতে ডাল, অন্য একটি ছোট্ট বাটিতে দুধ এবং গেলাসে জল দেওয়ার ত্রুটি কোনদিন হয় না; পৃথকভাবে বিবেকবাবুকে সমস্ত জিনিস দেওয়া হলেও সে নিজে কোন জিনিসই খেতে পারে না, ডাল ভাত তরকারী ও দুধ দিয়ে একাকার করে' দিয়ে কখনও কখনও দুটি ছোট্ট আঙ্গুল একটি কি দুটি ডাল তুলে প্রকাণ্ড 'হাঁ' করে' মুখে দেয়, কখনও মুখে যায় কিন্তু অধিকাংশ চেষ্টাতেই মুখের বাইরে পড়ে শুধু আঙ্গুলটি ভিতরে গিয়ে বেরিয়ে আসে; প্রথম প্রথম এই লঙ্কাকাণ্ড দেখে লতা

তাকে খাইয়ে দিতে বসেছিল, ফল হয়েছিল বিপরীত, বিবেক রাগ করে' জলের পাত্রটি পায়ের ধাক্কা দিয়ে ফেলে নিজের পিঁড়ি থেকে নেবে একেবারে দাদুর পিছনে গিয়ে বিপরীত দিকে মুখ করে' কী বলেছিল !

"তোমার আস্পদ্দা কম নয় বৌমা—তুমি ওকে খাওয়াতে যাও, কেন ও কী ছেলেমানুষ নাকি ? তোমার ছেলে বুড়ো হ'ল, ওতে ওর অপমান হয় না—?" ব্যাপার দেখে অনতিদূরে দাড়িয়ে শাশুড়ী হেসে বলল।

"বাবার খাওয়া যে নষ্ট করবে মা—! দেখলেত কী করল !"

"খাওয়া কিছু নষ্ট করবে না, তাই বলে তুমি ওর আত্মসম্মানে ঘা দেবে আর ও আমার নাতি হয়ে সহ্য করবে—? অসম্ভব ! না দাদু, তুমি রাগ ক'র না—এস, তুমি নিজেই খাও—!"

ফলে তারপর থেকে বিবেকবাবুর লঙ্কাকাণ্ড নির্ব্বিবাদে চলতে থাকে। নিজের সম্মুখের সাজান জিনিসের উপর স্বেচ্ছাচার সে চালায় কিন্তু রাধামাধব নিজের থালার উপর প্রথমেই তার জন্য কিছু ভাত ডালের জল, একটু নুন ও লেবুর দুফোটা রস দিয়ে মেখে পৃথক করে রেখে দেয় এবং ওদিকে বিবেকের স্বেচ্ছাচার ও নিজের খাওয়ার ভীষণ ও ব্যর্থ প্রয়াসের মাঝে মাঝে তাকে খাইয়ে দেয় নিজের হাতে, এতে বিবেকের বিশেষ আপত্তি নাই এবং সেটাতেই তার পেট ভরে। ওদিকে বিবেক নিজে ক্রমাগত খাওয়ার চেষ্টা করছে এদিকে রাধামাধব যথারীতিতে তাকে খাইয়ে যাচ্ছে—একবার তার মুখে দিয়ে অন্যবার দিতে দেরী হ'লে বিবেক দাদুর দিকে তাকিয়ে ডান হাতটা কিঞ্চিৎ তুলে বলবে—"উঁ-উঁ-উঁ ঃ—"

"ও ভুলে গিয়েছিলাম দাদু—?" রাধামাধব তাড়াতাড়ি তার মুখে ভাত তুলে দেয়, বিবেক সে কয়টি ভাত চর্ব্বণ করতে করতে নিজে পুনরায় দু-তিন গ্রাস ভাত তুলে মুখে দেবার চেষ্টা করে। বিবেকের চারটি দাত

উঠেছে, উপরে দুটি এবং নীচে দুটি, শীতকালে পালং শীষের চচ্চরি রাধামাধবের বড় প্রিয় ব্যঞ্জন, খেতে বসে সর্ব্বপ্রথম একটি শক্ত শীষ জলে ধুয়ে বিবেকের হাতে দেয়, শিশু সেটি নিজের দাঁতের মধ্যে ফেলে ক্রমাগত চিবিয়ে যায়, এবং সে চেষ্টায় বহুক্ষণ ব্যস্ত থেকে নিজের লঙ্কাকাণ্ড ভুলে যায়, যখনই মনে পড়ে অর্দ্ধ-চর্ব্বিত ডাঁটাটি পুনরায় দাদুর থালার এক কোণে রেখে নিজের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়, কিছুক্ষণ পরে আবার সেই ডাঁটাটিকে তুলে নিয়ে আবার চর্ব্বণ করতে আরম্ভ করে ; এসব ব্যাপারে কাহারও হস্তক্ষেপ কিংবা বাধা দেবার অনুমতি ছিল না। কখনও বিবেক নিজের থালা থেকে একমুঠি ভাত নিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে নিজের নগ্নদেহে পেটে বুকে প্রলেপ দিয়ে দেয় ; ইচ্ছা হ'লে সে চেষ্টা দাদুর হাঁটুর উপরও অনায়াসে ও বিনা প্রতিবাদে প্রযোজ্য !

"বাবা, এঁটো দিয়ে যে সব একাকার করলে ও ছেলে—!"

"তা করুক বৌমা, ওর দেহ এঁটোতে অপবিত্তির হবে না, মুখ ধোয়াবার সময় জলের হাত দিয়ে একটু মুছিয়ে দিও, তুমি যেন হড় হড় করে' জল ঢেলে কোন দিন ওকে পবিত্তির করবার চেষ্টা করো না, ছেলের কিন্তু তাহ'লে অসুখ করবে—তোমাকে আমি আগেই সাবধান করে দিচ্ছি বাপু!"

"তা না হয় করলেন কিন্তু ওদিকে অপনার কাপড় শরীরও যে এঁটোয় একাকার হ'য়ে গেল—!"

"তা যাক্ ! খেয়ে উঠে আমি কাপডটা ছেড়ে একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করে' নেব ! এ আমার এঁটো নয় বৌমা, এ আমার গঙ্গাজল, দাদুর ছেলে হ'লে তুকি আমার কথাটা মনে করে' দেখ, তখন আমি থাকব না—!"

শ্বশুরের এ কথার পর কোন উত্তর দিতে লতা পারে না।

নিজের ছোট দুটি আঙ্গুল দিয়ে নিজের থালা থেকে দুচারটা ভাত তুলে নিজের মুখে দিতে দিতে কখনও বিবেক নিজের হাত প্রসারিত করত রাধামাধবের দিকে, মুখে ক্রমাগত বলত—"উঁ-উঁ—", রাধামাধব নিজের মুখটা অনেকখানি নামিয়ে হাঁ করত, বিবেক নিজের মুঠিটা সম্পূর্ণ তার দাদুর মুখের ভিতর পুরে' দিয়ে বলত—"য্যাঃ—!" অর্থাৎ খাও!
"বাঃ, দাদু, সুন্দর মাখা হয়েছে তোমার ভাত!" ব্যাপার দেখে লতা, কৃষ্ণদাসের মা হেসে উঠত, বিবেক গর্ব্ব-ভরা দৃষ্টিতে দুজনের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে নিজের পদ্ধতিতে মন দিত।
দুবেলা খাওয়ার পর রাধামাধবের নিয়ম ছিল পাত্রত্যাগ করার পূর্ব্বে গ্লাসের জলে একখণ্ড লেবুর রস চিপ্সে সেই জলটুকু পান করা, এটুকু তার বহু বৎসরের অভ্যাস, এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে বহুলোকের কাছে বক্তৃতা দিয়েছে, দ্বিপ্রহরে খাওয়ার পর সে বিবেককেও সে জল একটু পান করাত, প্রথম প্রথম তার স্ত্রী বলত—"আবার ওকে ও অভ্যেস করাচ্ছ কেন? ঐ উপাদেয় জিনিসটি ও বেচারাকে নাই বা খাওয়ালে—!"

"তুমি বোঝ না গো! ওতে লিভার ভাল থাকে—শিশুর লিভারই ত আসল জিনিস—!" রাধামাধব উত্তর দেয় যথারীতি।
দাদুর উপদেশের জন্যই হ'ক, কিংবা লিভার ভাল রাখার জন্যই হ'ক, জিনিসটি বিবেকের শুধু অভ্যাস নয় রীতিমত নেশায় পরিণত হয়েছে।
পদ্ধতিটি কিছুদিন বিবেক লক্ষ্য করল, তার স্বাদটিও ভাল লাগায় ক্রমে নেশায় বা শিশু-সুলভ অভ্যাসে পরিণত হ'ল, ফলে বিবেকের থালায় একখণ্ড লেবু দিবার আদেশ হ'ল। ব্যাপারটি পরে অদ্ভুতে পরিণত হ'ল,

থালা দেবার পরই বিবেক লেবুর খণ্ডটি নিয়ে নিজের জল ভরা গ্লাশে হাতটি সম্পূর্ণ চুবিয়ে দিত, ফলে জলটুকু সবই উপচে পড়ে যেত, নিজের জলের পাত্রে লেবুর রস দিয়ে', দাদুর দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলত "উঁ-উঁ—!" রাধামাধব ইঙ্গিতটুকু তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারত এবং নিজের জলের পাত্রটি বিবেকের সম্মুখে এগিয়ে দিত, বিবেক সেটাতেও লেবু শুদ্ধ হাতখানা নির্ব্বিকার চিত্তে ডুবিয়ে দিয়ে পরমোৎসাহে বলত—"য়্যাঃ—ঃ" অর্থাৎ খাও এবার।

"বাবা, গেলত আপনার জলটুকু! দেখুন ছেলের কাণ্ড!" লতা এবার যেন বিরক্ত হ'য়ে বলত।

"অন্য একটা গেলাশে আমায় আর এক গেলাশ জল দাও বৌমা— ও গেলাশটাও থাক, ওর জলটুকু ফেলে দিলে আবার হয়ত অনর্থ করবে। দাদুর আমার বুদ্ধি দেখছ বৌমা!" এর পর থেকে রাধামাধবকে দুগ্লাশ জল দেবার রীতি প্রবর্ত্তিত হল।

দ্বিপ্রহরে খাবার সময়ের এই দৃশ্য দৈনন্দিন ব্যবস্থাই যেন পরিণত হল। প্রত্যহ নূতনত্বের বিচিত্র ছাপ দিয়ে শিশু বিবেক বড় হ'তে লাগল, প্রতিদিনের কাহিনীর যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করলেও শুধু তার কয়েকদিনের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই একটা সম্পূর্ণ সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হ'তে পারে। সুতরাং তার গতানুগতিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং আপনার ধৈর্য্যের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বিস্তারিত কাহিনী থেকে বিরত থাকলাম।

ক্রমে বিবেক চার বৎসরের প্রান্তে পদার্পণ করল। বিবেক এখন যে মাত্র হাঁটতেই শিখেছে তা নয় সে এখন রীতিমত দৌড়িয়ে বেড়ায় দাদুর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ধরে' সকাল সন্ধ্যায় পাড়ায় বেড়িয়ে আসে, বাড়ীতে ফিরে 'ঠামু' অর্থাৎ কৃষ্ণদাসের মাকে এবং, 'বৌমা' অর্থাৎ নিজের

মাকে ভ্রমণ কাহিনী বিস্তারিত ভাবে খণ্ড খণ্ড করে' গল্প করে। কৃষ্ণদাসের মা ও রাধামাধবের ডাক শুনে শুনে বিবেক প্রথম থেকেই নিজের মাকে বৌমা' বলে' ডাকতে আরম্ভ করে, প্রথম প্রথম লতা আপত্তি করে' ছেলেকে ধমক দিলে, রাধামাধব ও তার স্ত্রী দুজনেই বারণ করেছিল—"বলুক না বৌমা, বেশ শোনায় ওর মুখে—বড় হ'লে আপনি বদলে নেবে যখন বুঝতে পারবে!" সেই থেকে লতাকে বিবেক বৌমা বলেই ডাকত, এবং পরের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে ভবিষ্যতেও বিবেক সে ডাক ছাড়তে পারে নাই, পরে যেন লতার কাছেই সে ডাকটি অধিক মিষ্ট লাগত, তখন তার পরলোকগত শ্বশুর শাশুড়ীর স্মৃতি পরিস্ফুট হ'ত বিবেকের সেই ডাকের বুকে। তিন বছরের শিশু বিবেক আশে-পাশের প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কখনও কখনও চলে যায় পালিয়ে তখন তার বাড়ীতে খুঁজে বেড়াবার ধূম পড়ে যায়, রাধামাধব ও তার স্ত্রী কোনমতেই পছন্দ করে না যে বিবেক একা একা পাশের বাড়ীতে চলে যায়, অতটুকু শিশুর কতপ্রকারের বিপদ আশতে পারে তার একটা সুদীর্ঘ তালিকা তারা মুখে মুখে দিয়ে দেয় লতার প্রতিবাদে। "বিপদের কী হাত পা আছে বৌমা? বিপদ ত আর হেটে আসে না! আর তা ছাড়া নানা রকমের বাতাস আছে, নানা লোকের নজর আছে—কেন বাপু একটু চোখে চোখে রাখতে পার না? কী এমন কুরুক্ষেত্তর যুদ্ধে থাক!" বিবিধ প্রকারের অশুভ বাতাস ও লোকের নজরের কুসংস্কারের হাত থেকে তারা তখনও মুক্ত হ'তে পারে নাই, ফলে বিবেকের কোমরের গুণসম্পন্ন দ্রব্যগুলি তখনও কালো সূতায় গাঁথা ত ছিলই অধিকন্তু দক্ষিণ হাতের কনুইএর ওপরে কয়েকটা মাদুলী এবং বুকের ওপর গলার সোনার হারের মুখে বিলম্বিত একটা দ্রব্যগুণ সম্পন্ন মাদুলীও

স্থান পেয়েছিল। অতগুলো রক্ষাকবচের কিছুমাত্র গুণ ছিল কি না প্রশ্ন করে' আমি রাধামাধব ও তার স্ত্রীর সূক্ষ্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না—অদৃশ্য দেবতার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করে' যদি সমগ্র পৃথিবী চলতে পারে, সে বিষয়ে বর্ণনাতীত ও অচিন্তনীয় কাহিনী গ্রন্থ, বেদ বেদান্তর সৃষ্টি হ'তে পারে তবে মাদুলীর অদৃশ্য গুণে বিশ্বাস না করবার আমি কোন হেতু দেখতে পাই না—বিশ্বাসই সব স্থানে প্রধান বস্তু, দ্রব্যটি নয়। কুবাতাস পৃথিবীতে আছে কি না জানি না, যে বাতাস শিশুদের প্রতি কুদৃষ্টি কিংবা কোন প্রকার দৃষ্টি দিতে পারে, কোন লোকের দৃষ্টি কাহারও অনিষ্ট করতে পারে কি না জানি না কিন্তু বিবেকের চেহারা যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য, সহস্র সুন্দর শিশুর মধ্যেও তার চেহারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, সে চেহারা একই লোকের দৃষ্টি দিনে বার বার আর্কর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে, প্রতিবারই তাকে দেখে তার প্রতি বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, নিজের অন্তর বলে ওঠে "বাঃ"—তা সে প্রকাশ্যেই হ'ক কিংবা মনে মনেই হ'ক।

বয়েসের প্রতি ধাপে বিবেকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাচ্ছে পরিপূর্ণতার দিকে পরম উৎকর্ষতার প্রতি। সুস্থ সবল দেহ, রক্তাভ তুষারশুভ্র দেহকান্তি, চোখ মুখ নাক এবং প্রতি অঙ্গের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৃতিত্ব, বিশেষ তার চোখের সৌন্দর্য্য, সে চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি-মাহাত্ম্য, সে দৃষ্টি যেন দর্শকের অন্তরের গভীর তলদেশ সম্যক্ দেখতে পারে, সে দৃষ্টি দর্শককে মুগ্ধ করে, সে দৃষ্টিতে অবর্ণনীয় এক ইঙ্গিত যেন পাওয়া যায়—বিবেকের সেই প্রকার অপরূপ দৃষ্টি দেখে বহু লোকে বহু কথা বলেছে, রাধামাধব নির্জ্জনে বসে কখনও চমকে উঠত তাঁর কথা মনে করে যিনি শিশুর নাম

তার জন্মের রাত্রে রেখেছিলেন বিবেকানন্দ অদ্ভুত এক ভবিষ্যৎবাণী বলেছিলেন—বহুবার বহুদিন বহুপ্রকারে চিন্তা করে' ক্রমে ক্রমে রাধামাধব শিশুর দৃষ্টিকে দৈবশক্তি সম্পন্ন সন্দেহ করে' যুক্ত করে গৃহ-দেবতার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছে—'ঠাকুর ওকে তুমি রক্ষা ক'রো—আমার এক দাদু যেন একশ হয়—! "বিবেকের ঘনকুঞ্চিত কেশ তার ঘাড় পর্য্যন্ত লুটিয়ে পড়ে' স্তবকে স্তবকে কুঞ্চিত হ'য়ে তার দেহরূপ যেন সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করে রাখত, তার পোষাক পরিয়ে দিয়ে লতা দুই বক্র ভ্রূর মাঝে কাজলের ছোট একটা টিপ দিয়ে দিত, তখন বিবেককে দেখে যে লোক নিজের অজ্ঞাতে না বলে উঠবে—"বাঃ!" আমি বলব সে লোক অন্ধ,—রাধামাধব সেই রূপমুগ্ধ উক্তিটাকেই 'নজর' মনে করত।

'বৌমা, তুমি আরও লোকের নজর ডেকে আনার ব্যবস্থা কর বাপু—দাদুকে নিয়ে আর কোন জায়গায় যাওয়াই চলে না দেখছি—পথে ঘাটে সর্ব্বত্র লোকে কী ছাই ওর দিকে হাঁ' করে তাকিয়ে থাকবে! কেনরে বাপু রোজই ত দেখছিস!—তুমি আবার তার ইন্ধন জোগাচ্ছ।" রাধামাধব কোন সময় বিবেককে সঙ্গে করে' বেড়াতে যাবার পূর্ব্বে শিশুর সাজসজ্জার দিকে তাকিয়ে বলে।

"কেন বাবা! আমি কী করলাম?" লতার বিস্মিত প্রশ্ন।

"একে ত এই পোষাকটাতে দাদুর ওপর নজরই পড়ে যায়, তার ওপর তুমি আবার একটা কাজলের রাখাল ফোটা দিয়ে দাও—আজ বোধ হয় আমারই নজর লাগল, তা অন্য লোকের কী দোষ দেব।"

"দাদুর আপনার চেহারাই ভাল বাবা, লোকে কী করবে—?"

"তুমিও এই কথা বললে বৌমা! কী এমন সৃষ্টিছাড়া চেহারা তোমার

ছেলের শুনি ? ঐ গরবেই তুমি আট খানা হও—মার নজর বড় লাগে বৌমা; লোকে বলে মার নজর না ডাইনির নজর—দাও বাপু ওর মাথায় একটু থুথু, ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা একটু কামড়েও দিও।” লতা শ্বশুরের আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়। “এই রাখাল ফোটা তুমি ওকে আর কোনদিন পরিয়ে দিও না বৌমা।”

“এই যে মুছে দিচ্ছি বাবা—” লতা বিবেকের রাখাল ফোটা মুছে দিল সেই মুহূর্ত্তে।

“হ্যাঁ মুছে দাও ; মুছে দিয়ে ওর কপালের ডানদিকে বড় করে’ একটা কাজলের ফোটা দিয়ে দাও, ওতে নজর কাটায়।” এই আদেশের পর থেকে কোথাও বেড়াতে যাবার পূর্ব্বে বিবেকের কপালের উপর একটি বড় কাজলের ফোটা পড়ত। নজর লাগার ভয়ে রাধামাধব বিবেককে সঙ্গে করে বিশেষ কোথাও বেড়াতে যেতে চাইতেন না, লোকের বাড়ী গেলে তাদের নজর ত আছেই, উপরন্তু বিবেককে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে তার অসাক্ষাতে খাওয়াবার ধূমও ছিল, মেয়েরা আদর করে’ বিবেক কোলে করত, চুমু খেত ঘরের মিষ্টি কিংবা এটা ওটা তার হাতে দিত খাবার জন্য যেটা রাধামাধব নিতান্ত অপছন্দ করত, আবার বাড়ীতে না নিয়ে পথে ঘাটে বেড়ালে খারাপ বাতাস ছাড়া, লোকের পথ চলতে চলতে নজরের হাত থেকেও অব্যাহতি পাবার উপায় নাই, অথচ বিবেককে বেড়াতে না নিয়ে গেলেও সে এখন একাই এদিক সেদিকে চলে যায়, সেটা যেন আরও বিপজ্জনক ! সুতরাং বাধ্য হ’য়ে রাধামাধব সকালে বিকালে তার দাদুকে সঙ্গে করে’ বেড়াতে যায়। পায়ে জুতা পরে, পরনে প্যাণ্ট গ্যালিস দিয়েও কাঁধের সঙ্গে লাগান, দেহের সুন্দর ছিটের সার্ট, কিংবা কোন দিন কম্‌বিনেসন পরে, কিংবা কোনদিন পাঞ্জাবী পরে জামাইএর মত এক

হাতে ফুলপাড় ধুতির একটি প্রান্ত ধরে অন্য হাতে দাদুর কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ধরে রীতিমত বিজ্ঞের মত বিবেক পথে চলে এবং নানাবিধ অসংলগ্ন প্রশ্নবাণে রাধামাধবকে জর্জ্জরিত করতে থাকে, রাধামাধবও তার প্রশ্নে বিরক্ত না হ'য়ে যথাযথ সদুত্তর দিয়ে যায়, কথোপকথনের ভিতর দিয়ে শিশুকে অনেক কিছু ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় এ তথ্যকে রাধামাধব শুধু বিশ্বাস করেনা রীতিমত শ্রদ্ধা করে।

অন্যান্য শিশু থেকে বিবেকের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেটা সাধারণ নয়, অনন্য সাধারণ, শিশুসুলভ চপলতা বিবেকের বিন্দুমাত্র ছিল, বুড়োর মত গভীর সে নয় অবশ্য কিন্তু অকারণ চপলতা তার ছিল না, রাধামাধবের হাত ধরে সে যখন প্রশ্ন করতে করতে পথে চলে তখন মনে হয় যেন কোন বিজ্ঞলোক চলেছে, অহেতুক দৌড়াদৌড়ি তার ছিল না, বাড়ীতে কিংবা পথে ঘাটে ধূলোবালি নিয়ে কখনও খেলা করতে দেখা যেত না, বাড়ীতে অকারণ দৌড়াও ছিল না।

পরিচয় জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের প্রথম সোপান, শিশুর জ্ঞান তখনই ফুটতে আরম্ভ করে যখন সে মানুষ চিনতে আরম্ভ করে, প্রথমে সে চেনে নিজের বাড়ীর লোকের মুখ, সম্পর্কের পার্থক্য প্রথমে করতে পারে না মাত্র মুখ চিনতে পারে, সুতরাং তখন বাড়ীর পুরাতন ঝি এবং নিজের মায়ে কোন পার্থক্য থাকে না, পরে সম্পর্ক বুঝতে পারে তার অন্তরে উপলব্ধি না করতে পারলেও ক্রমে সে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বুঝতে পারে না বটে কিন্তু পিতায় মাতায় কিংবা মাতায় ও পিতামহীতে পার্থক্যটুকু বুঝতে পারে, ক্রমে পরিচয় পরিমাণ বৃদ্ধিপায় এবং নিজের বাড়ীর বাহিরে বন্ধুর সংখ্যা হয়।

বিবেকের কয়েকটি বন্ধু হয়ে ছিল, কিন্তু অন্যান্য শিশুর তুলনায় তার

বন্ধু সংখ্যা স্বল্প ! বন্ধুদের বাড়ী তার বাড়ীর অতীব কাছে এবং তারা বিবেকের বাড়ীতে এসেই খেলা করত, সেটা কোন অভিভাবকের আদেশে নয় বোধ হয় বিবেকের আকর্ষণে কিংবা তার দলপতিত্বের শক্তিতে।

শিশুদের খেলায় কোন সুশৃঙ্খলা থাকে না, কোন গূঢ় অর্থও থাকে না কিন্তু তার প্রতি স্তরে স্তরে গভীর দার্শনিক তথ্য থাকে লুক্কায়িত যেটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকে। শিশুর খেলার বিষয়ে তারা নিজেরা বিন্দুমাত্র সচেতন নয় কিন্তু পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মনীষী, দার্শনিক মনস্তত্ববিদ সেই খেলাকে কেন্দ্র করে শিশুর মনস্তত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করে যাচ্ছেন—দেবতা এবং শিশু দুই যেন এখন সকল জ্ঞানের অগম্যই থেকে গেল, অবশ্য অনেক চিন্তাশীল মনীষীরা নারীকেও তৃতীয় স্থান দিবার ইচ্ছা করেন।

বিবেকেরও সামান্য কয়েকটি খেলাই প্রিয় ছিল, তার মধ্যে যেটি তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সেইটির বিষয়েই এখানে সামান্য পরিচয় দেব।

বিবেকের প্রিয়তম খেলা ছিল পূজো পূজো খেলা, পিতামহ রাধামাধবের পূজা, বাড়ীতে গৃহদেবতার মন্দির, সে মন্দিরে গৃহদেবতার দৈনন্দিন পূজা, নৈবেদ্য আরতি শিশু বিবেক জ্ঞান হওয়া অবধি দেখছে এবং তার অন্তরে জ্ঞানের সামান্য আলোকসম্পাতের পর থেকেই মন্দিরের আনুপূর্ব্বিক কার্য্যাবলীর একটা সংলগ্নহীন তালিকা শিশুর মনে স্থান পেয়েছিল, ফলে যখনই তার জীবনে খেলার প্রেরণা এল, সেটা এল এই পূজাকেই কেন্দ্র করে'। বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গনের এক নিভৃত কোণে দাদুর মন্দিরের পার্শ্বে বিবেক নিজের দেবতার মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করল, অর্থাৎ মন্দির হীন গৃহদেবতার আসন পড়ল কয়েক খানা ইষ্টক খণ্ডের উপর।

সামান্য স্থান পরিষ্কার করে' কয়েক খানা ইঁট পেতে দেওয়া হল, আচরণ-হীন ইঁটের উপর মার কাছে থেকে নারায়ণের একটি মৃন্ময় মূর্ত্তি বহু কান্নাকাটির পর ভিক্ষা করে' মহাসমারোহে স্থাপিত হল, সে উৎসবে বিবেক মা, বাবা, দাদু ও ঠামুকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কাঠাল পাতার তরকারি লাল তেলাকুচার তরকারি, ধূলোর ভাত প্রভৃতি বিবিধ ব্যঞ্জন করে' নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করা হয়েছিল, বাবা বাড়ী ছিল না, মা বলেছিল—"আমার বাপু অনেক কাজ আছে তোমার এই খেলায় পাগল হ'তে পারব না—'মার অভিমতে বিবেক অতিশয় দুঃখিত হয়েছিল কিন্তু দাদু ও ঠামু নিমন্ত্রণে যোগ দিয়েও বিবিধরূপে সাহায্য করে বিবেককে ধন্য করেছিল—বহু বন্ধুবান্ধবও সে উৎসবে যোগদান করে বিবেককে আপ্যায়িত করেছিল।

বিবেকের দেবতার স্থান হ'ল বাড়ীর নগণ্য এক অংশে, সামান্য স্থান জুড়ে এবং বিবেকের সমস্ত অন্তরটা জুড়ে' ; তাঁরপর থেকে প্রত্যহ ফুল নৈবেদ্য দিয়ে বিবেক দাদুর অনুকরণে নিজের গৃহদেবতার যথারীতি পূজা করতে থাকল, সকাল সন্ধ্যায় কাঁচা পাতা ও কাঁচা বন্য ফলের নৈবেদ্য এবং আগুন ও আলোহীন আরতিতে বিবেকের দেবতা সন্তুষ্টই ছিলেন। বিবেকের মনে ছিল যে দাদুর আরতিতে ধোঁয়া বের হয়, আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে অথচ তার নিজের আরতিতে কিছুরই প্রকাশ পায় না, পার্থক্যটুকু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও কতকটা মার কাছে ব্যক্ত করতে পেরেছিল। মা উত্তর দিয়ে ছিল—

"হ্যাঁ, এখন ওটাই বাকি আছে, পুড়ে' না মরলে চলবে কেন ?" সুতরাং বিবেকের দেবতাকে আলোকহীন পঞ্চপ্রদীপের আরতিতেই তুষ্ট হ'তে হয়েছে।

স্বল্প বাক্য সম্পন্ন বিবেকের নির্ব্বাক দেবতার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হয়েই হয়ত রাধামাধব তার প্রতি করুণা দেখাল। ভিতরের বারান্দাটি লম্বালম্বি ভাবে কৃষ্ণদাসের ঘরের সম্মুখে শেষ হয়েছে, তার শেষ প্রান্ত বন্ধ ছিল, এক পাশে ঘরের দেওয়াল, মাত্র দুদিক তার খোলা ছিল, রাধামাধব তার উঠানের দিকটি বন্ধ করে দিল এবং সম্মুখের দিক খোলা রেখে দিল, ফলে স্বল্পপরিসর একটু স্থান চতুর্দ্দিকে বন্ধ হওয়ায় দিব্য একটি ঘরের আকার পেল—উপরে বারান্দার ছাদ, সম্মুখের মুক্ত স্থানটুকু একটি ছোট্ট বাঁশের ঝাঁপ দ্বারের কাজ করল। সেই ঘরটুকুর উপরে, ভূমি থেকে চার পাঁচ হাত উপরে রাধামাধব কাপড়ের একটা গেরুয়া আচ্ছাদন করে দিল। মৃন্ময়মূর্ত্তির জন্য কাঠের সিংহাসন হল, নৈবেদ্য ও পূজার জন্য ছোট ছোট কাঁসার বাসন কেনা হ'ল, সর্ব্বশেষে দৈনন্দিন পূজার জন্য মার উপর আদেশ হ'ল যে সে প্রত্যহ কিছু চাল, ডাল, তরকারী পাবে, রীতিমত দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা। দাদুকে বিবেকের এত ভাল লাগে।

মহাসমারোহে নূতন মন্দিরে বিবেকের ঠাকুরের নূতন প্রতিষ্ঠা হ'ল, এবার রীতিমত পূজা, ভোগ আরতি প্রভৃতি, নৈবেদ্য অবশ্য কাঁচা চাল ডালেরই হ'য়েছিল কিন্তু সেদিন দাদু গ্রামের সমস্ত শিশুকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে' খাইয়েছিল। সেদিন মাকে যা খাটতে হয়েছিল দাদুর হুকুমে! বিবেকের খুব ভাল লেগেছিল।

পরদিন থেকে বিবেক নিজেই পূজা করতে থাকল, দৈনন্দিন জিনিস পত্র ঠামুর ভাণ্ডার থেকে দাদুর আদেশক্রমে যথারীতি আসতে লাগল। "বাবা—বেশত উঠোনে খেলছিল। আপনি যে একেবারে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন, জায়গা, আসন, বাসন, ভোগের বরাদ্দ—এবার কিন্তু খোকন বিরক্তের একশেষ করবে—!" লতা শ্বশুরকে বলল।

"খেলুক না বৌমা, তবু ত একটা নিয়ে থাকবে, পাড়ায় পাড়ায় বেড়ানর চেয়ে এ অনেক ভাল। আর উঠোনে খেলতে, সাপ পোকা মাকড়ের ভয়, বারান্দার এক কোণে তোমাদের কি অসুবিধা করছে বাপু। তোমাদের কিছু বিরক্ত করে না, রোজ সকালে ওর ঠাকুরের বরাদ্দটা বের করে দিও, ব্যস্ চুকে যাবে সব। চাল ডাল দিতে দেরী করো না যেন—" খেতে বসে শ্বশুর পুত্রবধূতে কথা হচ্ছিল, বিবেক দাদুর পাশে বসে খাচ্ছিল।

"জান দাদু, মা আজ ভোগ দিতে দেলি কল্‌ল্, তোমাল পূজোল পল দিল—" বিলম্বের অভিযোগ জানাল বিবেক।

"আমার কাজ নেই? তোমার খেলা নিয়ে থাকলে আমার চলবে!" লতা পুত্রের কথার প্রতিবাদ জানাল।

"বেশ—আমায় ঠামু দেবে—না ঠামু?" আশায় বিবেক অদূরে দণ্ডায়-মানা ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোন উত্তর পেল না।

"না না, বৌমা, ওর বরাদ্দটা দিতে দেরী কর না—দুটো চাল ডাল আর দুটো আলু পটল—সকালে উঠেই দিয়ে দিও—ফুল তোমাকে আমি দেব দাদু—রোজ আমার কাছ থেকে মন্দিরে গিয়ে নিয়ে এস—কেমন? তুমি যেন একা একা বাগানে যেও না—তাতে ঠাকুর রাগ করবেন—কেমন? দাদুর কথায় বিবেক মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

"ওর খেলায় আমার কোন আপত্তি নেই গো—কিন্তু ওর জন্মের রাত্রে সেই ঠাকুর যা বলেছিলেন তাতে যেন মনে হয় ওকে এ খেলায় প্রশ্রয় না দিলেই ভাল হয়—ঠাকুরের সে কথাটা আমার মনে এখনও যেন ধক্ করে লাগে—আমার এক বিবেক একশ হ'ক—ঠাকুর যেন এই করেন—" এতক্ষণে রাধামাধবের স্ত্রী প্রতিবাদ করে, বিবেকের এই

খেলাটি তার মনে বরাবর একটা কাঁটার মত বিদ্ধ করে এসেছে, ছেলে-মানুষের নিতান্ত খেলাই জ্ঞান করে' কোন দিন কিছু বলে নাই, কিন্তু সে খেলায় বিবেকের উত্তরোত্তর আকর্ষণ দেখে, তার জন্মরাত্রের সেই আগন্তুকের ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করে' তার মনে, নারীর দুর্ব্বলচিত্তের কোন গোপন কোণে কি জানি কেন একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল।

রাধামাধব কথাটা একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলো, স্ত্রীর কথায় অকস্মাৎ যেন তার স্বচ্ছ মনের কোণে একখণ্ড কালো মেঘের উদয় হ'ল, একটু চমকে উঠল।

খেলাচ্ছলে হ'লেও সে খেলা দেবতার পূজা কেন্দ্র করে', পবিত্রতম শিশুর পূজা দেবতার উদ্দেশ্যে স্থতরাং রাধামাধবের বৃদ্ধ দুর্ব্বল চিত্ত সে পূজাকে, সে খেলাকে বাধা দিতে দ্বিধা বোধ করল, শুধু মনে মনে নিজের ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাল—"ঠাকুর, ও যেন আমার সংসারকে ভরে' তুলতে পারে, ওর ভিতর দিয়ে যেন আমার রক্ত হাজার হাজার বছর যায়—!" নীরবে প্রার্থনা করা ভিন্ন রাধামাধবের গত্যন্তর ছিল না।

"তোমার যেমন কথা! আমার ঠাকুর কি এতই পাষাণ গো—!" রাধামাধব স্ত্রীর কথার উত্তর দিয়ে নিজের এবং সকলের সন্দেহের মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করে।

বিবেকের পূজা যথারীতি অব্যাহত চলতে থাকে।

বিবেকের পূজার খেলায় কিংবা খেলার পূজায় এবং অন্যান্ত খেলায় কয়েকজন সাথী ছিল, বহু নয়; তার সাথী যেমন মুষ্টিমেয় তেমনি বাছাই করা—তাদের সকলের পরিচয় এ কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক, তবে একজনের পরিচয় তেমনই অত্যাবশ্যক, সুতরাং তাঁর পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হলাম। সে একটি মেয়ে

এবং বিবেকের দলের মধ্যে একমাত্র সেই মেয়ে যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, কারণ নিজের দলে দলপতি বিবেক নারীকে স্থান দিতে একেবারে অনিচ্ছুক। এই মেয়েটি কিভাবে যে বিবেকের দলে এবং তার নারীবিদ্বেষী মনে স্থান পেয়েছিল তা সে নিজেই জানে না—শুধু এইটুকু জানে যে তাকে সে খুব ভালবাসে সে বিবেককে খুব ভালবাসে, প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে কারণে এবং অকারণে বিবেক তাকে প্রচুর প্রহার দেয়, মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে যায় এবং সকালে পূজার সময় যথারীতি এসে পূজার আয়োজন, নৈবেদ্য ও ভোগের ব্যবস্থা করে, না হ'লে বিবেকের একার সাধ্য কী যে পূজার পাঠ সামলাতে পারে। সে মেয়েটির নাম সরস্বতী, সকলে তাকে সে নামের অপভ্রংশ করে' ডাকে সুরো বলে', এ কাহিনীতে তাকে আপনি সুরো রূপেই অধিকাংশ সময়ে দেখতে পাবেন ; পরমাসুন্দরী মেয়েটি, তার মা বাবা ও আত্মীয়রা মেয়ের রূপ দেখে বড় সাধ করে' তার নাম রেখেছিল সরস্বতী, দেবী সরস্বতীর কি প্রকার রূপ জানি না, স্বয়ং দেবীর সাক্ষাৎ দূরের কথা, প্রতিবিম্বও কখন দেখি নাই, তবে কারিকররা কিংবা শাস্ত্রকাররা দেবীর যে রূপ অঙ্কিত করে হয়ত বা মেয়েটির রূপ তাকেও ম্লান করেছে, এখানে অবশ্য মাহাত্ম্যের কথা ওঠেই না। বিবেকের রূপ কী প্রকারের তা আপনি দেখেছেন, সুতরাং মেয়েটির রূপ বর্ণনার ইতিহাস দিয়ে আপনাকে আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে মেয়েটি যেন রূপে বিবেককেও ম্লান করে দিয়েছে।

রাধামাধবের প্রতিবেশী দিগম্বর রায়ের পুত্র ভূতনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বা সন্তান সরস্বতী, দিগম্বর শুধু রাধামাধবের পরম বন্ধু নয়, দুঃখে সম্পদে আত্মীয়াধিক, ভূতনাথ কৃষ্ণদাসের চেয়ে বয়েসে কিছু ছোটই হবে, তাকে

সে 'কেষ্টদা' বলে ডাকে, তার স্ত্রী লতার চেয়ে ছোট বয়েসে এবং লতাকে দিদি বলে ডাকে, রাধামাধবের স্ত্রীকেও দিগম্বরের স্ত্রী দিদি বলে ডাকে, দুই সংসার পরস্পরের বিপদে আপদে সুখে সম্পদে সম্মুখে এসে বুক পেতে দাঁড়ায়, যেটা সোনাপুরে কিছু আশ্চর্য্য জিনিস নয়।

সরস্বতী এই ভূতনাথের প্রথম সন্তান ও দিগম্বরের মহা আদরের নাতনি! সরস্বতীর পরিচয় এখানে দিলাম কারণ তার কাহিনী আমাদের প্রধান কাহিনীর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত, সোনামুখী নদীর বাঁকে বাঁকে যেমন সোনাপুরের সৃষ্টি তেমনি।

আমি জানি আপনি এখনই মনে মনে বললেন—'সর্ব্বনাশ! এযে আবার সেই নারীর উপস্থিতি! সাধারণ, অতীব সাধারণ কাহিনীর মত এতেও যে এল একটি মেয়ে, হয়ত বা সেই চিরপুরাতন প্রেমের কথা আসবে, পুরুষ নারী পচা সম্পর্কের কথা বিনিয়ে বিনিয়ে আবার বলা হবে—এতক্ষণ বেশ ত চলছিল একটা নতুন জিনিস!' এমনি একটা সুতীব্র অভিমত এখন আপনার মনে নিশ্চয়ই উদিত হল, কারণ আমারও মনে একই কথার উদয় হল যে! কিন্তু আপনাকে ভরসা দিতে পারি যে পুরাতন পচা নরনারীর সম্পর্ক থেকে আপনার রসপিপাসু মনকে মুক্ত রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু এ কাহিনীর সত্যতাটুকু অটুট রাখতে হ'লে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যে আপনার মনে রসপিপাসার জন্যই! একমাত্র গগনচুম্বী হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ শীর্ষের কাহিনী লিখতে হ'লে হয়ত কোন নারীর কথা আসে না, কিন্তু হয়ত ধূসরমরু সাহারার গর্ভ ভাগের কাহিনী বলতে হ'লেও নারীর আবির্ভাব হয়, পুরুষের কাহিনী নারীর কথা ব্যতীত শুধু অদ্ভুত নয়, আমার মতে অসম্ভব! কী বললেন? পুরুষের ইতিহাস লিখতে কিংবা তার জীবনের সুখদুঃখের

কাহিনী লিখতে নারীর কথা কোন প্রয়োজনই নাই? এই মত আমিও পোষণ করি কিন্তু সামান্য ভিন্নভাবে!

ফটো তুলবার যন্ত্রের অনুভূতিশীল প্লেটের বুকে সম্মুখের পদার্থের যথার্থ অনুলিপি ফুটিয়ে তুল্‌তে পশ্চাতে কালো আবণের প্রয়োজন, তার আসল রূপ প্রকাশিত করতে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানের প্রয়োজন, আকাশে গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতির্ম্ময় রূপ ফুটে উঠতে কালো আকাশের প্রয়োজন, সূর্য্যের তীব্র তেজ, চন্দ্রের স্নিগ্ধতম কিরণ পরিপূর্ণ হতে পারে শুধু অন্ধকার পৃথিবীতে তারা প্রকাশ পায় বলে, শুভ্রতার মূল্য যেমন কালোর সামান্য কলঙ্ক বৃদ্ধি করে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে যেমন কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে কিংবা সামান্যতম বর্ণপরিচয় শেখাতেও সাদা চক্ দিয়ে লিখতে হ'লে পশ্চাদ্‌পট হিসাবে কালো বোর্ডের প্রয়োজন—তেমনই পুরুষের যথার্থ রূপকে প্রকাশ করতে হলে, তার পূর্ণত্বকে পরিস্ফুট করতে হলে পশ্চাদপট হিসাবে নারীর অস্তিত্ব অনিবার্য্য।

আকর্ষণ শক্তিকে কেন্দ্র করে' সমগ্র সৌরজগৎ এখন সুশৃঙ্খলায় চলছে, পরস্পরের সঙ্গে আঘাত লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায় নাই, প্রতি মুহূর্ত্ত নিজের সময় দূরত্ব ঠিক রেখে চলেছে—বৈজ্ঞানিক তথ্যের যেমন কয়েকটি মূলতত্ত্ব আছে যার উপর ভিত্তি করে' সৃষ্টির অণুপরমাণু নিজের কার্য্য সুসম্পন্ন করছে—এই পৃথিবীর জীব-জগতে স্ত্রী-জীব প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র, এবং বোধ হয় একমাত্র কেন্দ্র। জৈবজগতে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব বলে' সে এই সমস্যার সমাধান সর্ব্বপ্রথমে করতে পেরেছে আংশিক ভাবে যদিও আজও সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই; মানুষের আদি ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে স্ত্রীকে কেন্দ্র করে, নারীকে নিজের করবার অভিপ্রায় ও চেষ্টাতেই মানুষ দলবদ্ধ,

বন্যজীবন থেকে ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র সংসারে এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্যান্য জীবজগতে এই মহাপ্রচেষ্টা এখনও চলছে সেটা বোধ হয় সামান্য লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, নাম মাত্র অনুধাবনের প্রয়োজন।

বিবেকের জীবনেতিহাসে কোন নারীর আবির্ভাব করাতে না পারলে আমার নিজের বিবেকও অনাহত থাকত, কিন্তু এটা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, তার জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তার সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে সরস্বতীর উপস্থিতিই শুধু প্রয়োজনীয় নয়, বিবেকের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সরস্বতীর সুর মূর্চ্ছনা তুলেছে।

পুরাতন গতানুগতিক প্রেমের কাহিনী শুনিয়ে আপনার রসপিপাসাকে আমি আঘাত না করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

চার

= কৈশোর =

কবিরা কালের সঙ্গে ঘূর্ণমান চক্রের তুলনা করেছে, চাকা ঘুরে যায় তার ঘূর্ণনের সঙ্গে কালের তুলনা সঠিক চলে না, সময় ঠিক ঘোরে না, চাকা ঘোরে, নীচের অংশ উপরে ওঠে, উপরের অংশ পুনরায় নীচে নেমে আসে, সময়ের এই প্রকার নামা-ওঠা হয় কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, সময়ের এইরূপ পুনরাবৃত্তি দেখি না, অনেকে বলেন যে ইতিহাস পুনাবৃত্তি করে, আমি বিশ্বাস করি না অন্তত পক্ষে ভারতবর্ষে তার কোন ইঙ্গিতও পাই না। চাকা ঘুরতে ঘুরতে গতি আনে, গাড়ী অগ্রসর হয়, শুধু সেই টুকুর সঙ্গে সময়ের তুলনা চলে—সময়ের গতি আছে, সে এগিয়ে চলে পশ্চাতের পুনরাবৃত্তি করবার জন্য নয়।

সোনাপুরে রাধামাধবের সংসারের গতিও ইতিমধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। আরও পাঁচ বৎসর কালের কাহিনী লিখে গেছে সোনাপুর গ্রামের ইতিহাসে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, গতির সঙ্গে কাহিনীরও গতি হয়েছে, পুনরাবৃত্তি না করে কিছু উত্থান পতনও হয়েছে, সোনামুখীর স্রোত এগিয়ে গেছে পশ্চাতে না তাকিয়ে, পূর্ব্বের স্রোত কত নদনদী অতিক্রম করে' এখন হয়ত স্রোতহীন সমুদ্রের বুকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে সোনাপুরের কাহিনীকেও লিপিবদ্ধ করছে। সোনামুখীর স্রোতের সঙ্গে সোনাপুরের কাহিনীস্রোতও এগিয়ে গেছে।

রাধাবাধবের সংসারেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে; গৃহ-দেবতা রাধামাধব নির্ব্বাক পাথরই থেকে গেছেন, নিশ্চল দৃষ্টি দিয়ে সম্মুখের কাহিনী শুধু দেখে গেছেন মাত্র বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেন নাই। কৃষ্ণদাসের মা মারা গেছে প্রথমে, মৃতদেহ সম্মুখে করে' কৃষ্ণদাস ও লতা শিশুর মত কেঁদেছিল, রাধামাধব পাথরের মত শুধু দেখছিল—একবার মাত্র বলেছিল "এতদিনের সঙ্গী ছিল—" দ্বিতীয় কথা বলতে পারে নাই, এই একটি অভিমত প্রকাশ করবার সময় তার দুচোখ দিয়ে দুটি অশ্রুধারা নিঃশব্দে আত্ম প্রকাশ করেছিল, তারপর আর এক বিন্দুও জল পড়ে নাই। পাড়ার মেয়েরা কৃষ্ণদাসের মার কপাল ও সিঁথি সিন্দূরে রঞ্জিত করে, পায়ের পাতা আলতায় ডুবিয়ে, দেহকে লাল-পেড়ে নূতন বস্ত্রে মুড়ে দিয়েছিল—মৃতদেহের সিঁথির সিঁদূর থেকে সিঁদূর তুলে সদ্য-বিবাহিতা থেকে আরম্ভ করে সধবা বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই নিজের নিজের সিঁথিতে লাগাল; এ প্রথার পশ্চাতে হিন্দুদের একটি মহৎ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর তিন মাস পরই রাধামাধবও দেহরক্ষা করল, এবার কৃষ্ণদাস এবং লতা কাঁদবার সময় পায় নাই—তার মৃত্যুতে তারা মাথার উপর যেন একটি গুরুভার উপলব্ধি করল, মার মৃত্যুতে যেমন শূন্য অনুভব করেছিল।

দুজনের মৃত্যুর সময়ই বিবেক গৃহদেবতার মতই নিশ্চল ভাবে তাকিয়ে ছিল সকলের মুখের দিকে। মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকে সে শুধু দাদু ও ঠামুর শূন্য স্থানটুকু উপলব্ধি করতে পারল তখন দুচার দিন মাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে উত্তর করেছিল তার সত্যতার কোন প্রমাণ পরে পায় নাই। তিন বৎসর হ'ল দাদু কিংবা ঠামুর প্রত্যাবর্ত্তনের

কোনরূপ আশা না দেখে বিবেক সম্প্রতি তাদের বিষয়ে কোন প্রশ্নই করে না, কারণ বিবেক এখন এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে মা যতই বলুক না কেন তারা দুজনে এমন কোন স্থানে গেছেন যেখান থেকে তাঁদের প্রত্যাবর্ত্তনেয় কোন আশাই নাই।

আজ শিশু বিবেক পূর্ণ দশ বৎসরে পদার্পণ করেছে, কিশোর জীবনের প্রথম সোপানে শিশুর পদার্পণ।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও গুরুভার পড়ল লতার মাথার উপর, তার মাথার উপর থেকে যেন আচ্ছাদন দূর হ'য়ে তাকে প্রখর তাপে ছেড়ে দিল, শয্যাত্যাগ থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যান্ত লতা প্রতি দিনটি পূর্ব্বে বিচিত্রবর্ণের বুদ্‌বুদ উড়িয়ে কাটাত, বিবাহিত জীবনের পুরানত্ব বিন্দুমাত্র উপলব্ধি না করে তখনও রাত্রে স্বামীর কাছে যাবার পূর্ব্বে ফুলশয্যা রাত্রের মাদকতা উপলব্ধি করত। সোনামুখীর স্রোতে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেওয়ার মত লতা পূর্ব্বে সংসার চালাত, শাশুড়ীর মৃত্যুর পর সেই স্রোতেই যেন সে উজান বয়ে চলেছে।

পিতার মৃত্যুর পর সংসার ও গৃহদেবতার সম্পূর্ণ ভার কৃষ্ণদাসের মাথার উপর এসে উপস্থিত হ'ল, ক্ষেতখামারের ব্যবস্থা, মন্দিরের পূজার সুব্যবস্থা সংসারের খুঁটিনাটি প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে রাত্রে যখন কৃষ্ণদাস শয্যা গ্রহণ করত তখন দুবার দুর্গা নাম উচ্চারণ করার পরই চোখ ঘুমে ভেঙ্গে পড়ত। লতা গৃহকর্ম্ম শেষ করে' নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ভিন্ন শয্যায় বিবেকের পাশে শুয়ে তার মাথায় দুবার দেবতার নাম জপ করে নিজে ইষ্ট মন্ত্র জপ দুচারবার করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়ত। প্রভাতে পুনবার সেই একটানা স্রোত।

সোনাপুরে উচ্চবিদ্যালয় ছিল না, তার অর্দ্ধ মহত্বপ্রাপ্ত একটি বিদ্যালয় ছিল যেটাকে চলতি ভাষায় মিড্‌ল্ স্কুল বলা হয়, বিদ্যালয়টি ছাত্রদের বেতন, সাধারণের সাহায্যতে চলত, অবশিষ্ট যেটুকু প্রয়োজন থাকত (সেটুকুই অধিকাংশ) সেটুকু গ্রামের জমিদারের সাহায্যে পরিপুষ্ট হত, সুতরাং বিদ্যালয়টি জমিদারের নামে অভিহিত হত। বিদ্যালয়ের পরিচালনা সুন্দর, সাধারণের সহানুভূতি আন্তরিক এবং জমিদারের বদান্যতা পরিপূর্ণ ছিল।

রাধামাধবের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে পৌত্র বিবেককে উচ্চশিক্ষা দিয়ে নিজের স্বল্পবিদ্যা ও পুত্র কৃষ্ণদাসের অল্প বিদ্যার মনস্তাপ দূর করে, সেই আশাতেই সে বিবেককে সাত বৎসর বয়সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলো, সে প্রায়ই লতাকে নিজের প্রাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানাত যে বিবেককে কলেজের সব পাশগুলো উত্তীর্ণ করিয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট করবেন, ধর্ম্মে বাধা না দিলে সাগরপারে বিলেত পাঠিয়ে তাকে ব্যারিষ্টার করতেও দ্বিধা বোধ করতো না। রাধামাধবের ইচ্ছানুযায়ী একটি শুভদিনে বিবেকের হাতে খড়ি হ'ল, সে নিজে পৌত্রের হাত ধরে বিদ্যালয়ে পণ্ডিত মশায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ছিল, পণ্ডিত মশায় তৎক্ষণাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—

"তোমার নাতি কালে একজন 'দেশোজ্জ্বল' ব্যক্তি হবে রাধামাধব—দেখে নিও এই বৃদ্ধের কথা—"

"সে আপনার আশীর্ব্বাদ পণ্ডিত মশাই—!" রাধামাধব যুক্তকরে ব্রাহ্মণকে বলেছিল।

"আরে না না—এ যে ওর কপালের রেখায় বলছে—শুধু কী আমার আশীর্ব্বাদ হে—!"

রাধামাধব বাড়ী ফিরে সে কথা স্ত্রী ও পুত্রবধূকে বলল, এবং সন্ধ্যায় পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীতে একটি মূল্যবান নৈবেদ্য পাঠাল।

বিবেক যে একটা কিছু হবে একথা যেন রাধামাধবের কাছে ধ্রুবসত্য বলে মনে হত। এক্ষেত্রে যে কোন ভবিষ্যৎবাণী আশু কাজ করত।

পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস বিবেকের বিদ্যার্জ্জনে বিন্দুমাত্র বাধা দেয় নাই, বরং তার মৃত্যুরপর যেন সেও উত্তরাধিকার সূত্রে রাধামাধবের সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পেল এবং সেটার উপর আরও বিভিন্ন বর্ণের ছাপ দিতে লাগল। উত্তর জীবনে বিবেক জজ হ'লে যে অবস্থা হবে তার উপর ভিত্তি রচনা করে কৃষ্ণদাস লতার সঙ্গে রাত্রে বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনা রচনা করত। সুতরাং যথারীতি স্থিরচিত্তে বিবেকও বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে থাকল।

ছেলেদের স্কুলেই মেয়েদেরও লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল, এটা বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন থেকে বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না কারণ ব্যবস্থাটা গ্রামবাসীরা প্রবর্ত্তন করতে চেত না, কিন্তু যেবার জমিদার বাবু গ্রামে শুভপদার্পণ করলেন, যেবার বিদ্যালয়ে সমগ্র সোনাপুর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাল সাহায্য প্রার্থনা, জমিদার বাবু সেদিন সদ্যমৃত স্ত্রীর নাম স্মরণ সভায় জানালেন যে তিনি সাহায্য করতে স্বীকৃত বিদ্যালয় যত সাহায্য চায়, কালে সেটাকে তিনি উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। সোনাপুর বিদ্যালয় সেই দিন থেকে নূতন নাম গ্রহণ করল—সে একটা চিরস্মরণীয় বিদ্যালয়ের পক্ষে। জমিদারের বদান্যতার প্রধান সর্ত্ত ছিল যে বিদ্যালয়ে ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে, এবং যেদিন সেটা উচ্চ বিদ্যালয় হবে তার জন্য পৃথক বাড়ী হবে এবং পুরাতন বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী চালিত পৃথক বালিকা বিদ্যালয় হবে।

সোনাপুর জনসাধারণ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অর্থহীন অন্ধ মতামত পোষণ করত না বটে কিন্তু গ্রাম্য আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। প্রথম কয়েক মাস প্রস্তাবটি কাগজে কলমেই থেকে গেল, একদিন জমিদার মশায়ের চিঠি পেয়ে প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হল সামান্য ছুএকটি শিশু কন্যা ছাত্রী ভর্ত্তি করে।

সে আজ ন' বছর পূর্ব্বের কথা।

এখন বিদ্যালয়ে মেয়েরা রীতিমত পড়ে, সংখ্যাও কম নয়, ব্যবস্থাও সুন্দর—তবে তাদের জন্য একটি কড়া নিয়ম আছে—কোন ছাত্রীর বয়েস দশ বৎসর হলে সে আর বিদ্যালয়ে থাকতে পারবে :না। এ ব্যবস্থাতেও সোনাপুরের সহশিক্ষার ব্যবস্থা বহু মেয়েকে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক এবং ফাষ্টবুকের ঘোড়ার গল্প পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়েছে।

সরস্বতীও স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, বিবেকের সঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করত এবং ছুবেলা বিবেকদার কাছে এসে নিবিষ্টমনে পড়ত।

সৃষ্টিছাড়া না হ'লেও গ্রাম-ছাড়া একটা আকাঙ্ক্ষা সুরোর বাপ-মার মনে ছিল যে মেয়েকে তারা কলেজে কয়েকটা দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে, তীব্র আলোচনার ভয়ে তারা অন্যকে সে কথা জানায় নাই, কখনও কখনও কৃষ্ণদাসও লতাকে বলত।

"বেশ হবে ভাই—তোমার সুরোর যে চেহারা, কলেজে পড়লে ওর নিশ্চয়ই কোন [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে বিয়ে হবে—পরে যেন মত বদলিয়ে দিও না।" কৃষ্ণদাস বলত।

"না কেষ্টদা—এটা আমার বড় গোপন ইচ্ছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ পাত্র ত আমার ঠিকই আছে—দূরদেশে খুঁজে মরবে কেন?" ভূতনাথ মৃদু হেসে ইঙ্গিত করে।

"তোমরা দশ জনে আশীর্ব্বাদ কর ভাই—আমার বিবেক তোমাকেই দেব।" দেওয়ালে একটা টিকটিকির টিক্‌টিক্ শব্দের সঙ্গে তাল দিয়ে ভূতনাথ দুবার বল্লে—"সত্যি—সত্যি"

বিবেকের খেলার পূজা এখনও রীতিমত চলছে, তবে তার স্থান বারান্দা থেকে মন্দিরের ভিতরে স্থানান্তরিত হয়েছে, বাবাকে দিয়ে সহর থেকে কিঞ্চিৎ বড় একটি মূর্ত্তি আনিয়ে সেটিকে যথারীতি মন্দিরের ভিতরে এক কোণে স্থাপিত করা হয়েছে—ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে, ভোগ নৈবেদ্য আরতি প্রভৃতি রীতিমত বাস্তবরূপ প্রতিদিনে পরিগ্রহণ করছে; এখন আর কাঁঠাল পাতার, তেলাকুচার বা ধূলার কিংবা কাঁচা আলু পটলে ভোগ নয়, শিখাহীন প্রদীপের আরতি নয়—তার পূজার ব্যবস্থা দেখে মনে হয় যেন মন্দিরে গৃহদেবতার পূজারতি ক্ষুদ্র সংস্করণ তার পার্শ্বেই অদূরে চলছে। শক্তিতে না হলেও দু দেবতার পার্থক্য সামান্য,—একটির আকৃতি, পূজার্চ্চনার, বাসনপত্র ও পূজারীর খর্ব্বাকৃতিই একমাত্র পার্থক্য।

মন্দিরের ভিতরে বিবেকের ঠাকুরের প্রবেশ রাধামাধবের মৃত্যুর পর। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় একই মন্দিরে দুটি মূর্ত্তির পূজা হয়, একটি সম্মুখে কৃষ্ণদাস পূজা করে, তার স্ত্রী পট্টবস্ত্র পরে' আয়োজন করে দেয়, অন্যটির সম্মুখে বিবেক পূজা করে সরস্বতী বসে সব আয়োজন করে। নিজের ঠাকুরের দ্বিপ্রাহরিক ব্যবস্থাটুকু শুধু বিবেক নিজের মার উপর ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছে বিদ্যালয়ের জন্য।

বিবেক যখন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে চায় তখন লতা বাধা দিয়েছিল—সে বাধা পুত্রের লেখাপড়ার বিঘ্নের জন্য নয়, তার জন্মরাত্রের সেই আগন্তুকের কথা স্মরণ করে'—কথাটি প্রায়ই মাতৃহৃদয়কে

বিদ্ধ করে, সেই কথা স্মরণ করেই লতাও দেবপূজায় বাধা দিতে বাধ্য হয়।

"শুনছ, খোকনকে এখন ওর পুজোপাঠে মানা কর, এতদিন ছেলেখেলা ছিল, জিনিসটা আস্তে আস্তে যেন অন্য ব্যাপার হচ্ছে; পড়াশুনা আছে, তা ছাড়া এখন বড় হয়েছে ত।" লতা একদিন স্বামীকে বলল, পড়াশুনায় বিন্দুমাত্র বাধার ভয় তার মনে উদয় হয় নাই, সে যুক্তিটুকু শুধু স্বামীর মনের উপযুক্ত করেই বলেছিল, তার প্রধান ভয় ছিল পুত্রের জন্মরাত্রে সেই আগন্তুকের ভবিষ্যৎ বাণী যে শাশুড়ীর কাছে বিভিন্নরূপে শুনে তার মনে রীতিমত উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল, সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালীরা স্বামী বিবেকানন্দকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, কিন্তু তাদের মেয়েরা কখনও ভুলেও প্রার্থনা করে না যে তাদের ছেলে স্বামী বিবেকানন্দ হ'ক, একমাত্র পুত্রের মাতার পক্ষে এ প্রার্থনা স্বপ্নাতীত—বাংলার গ্রামের মেয়েরা এখনও ষষ্ঠীপূজা করে। লতা বাংলার সেই মা—সে চায় তার ছেলে বিবেক বিবেকানন্দ না হ'য়ে সংসারী হ'ক—তার বিন্দু প্রমাণ অঙ্কুর বিশাল মহীরূহ হ'ক। 'বিবেকের পূজার ব্যবস্থা দেখে প্রথমে বহুপ্রকার চিন্তা করে' পরে একদিন স্বামীকে বলতে বাধ্য হ'ল; পুত্রের ক্রমবর্দ্ধমান পূজাশক্তিটি কৃষ্ণদাসেরও বিশেষ ভাল লাগছিল না, যে ভীতিটুকু মাতৃহৃদয়ে ক্রমাগত দোলা দিচ্ছিল সেই প্রকার ভয়ও মাঝে মাঝে পিতৃহৃদয়কে আঘাত করত কিন্তু ব্যাপারটি পূজাকে কেন্দ্র করে' বলে হিন্দুর প্রাণ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠত।

"আহা করুক। হিন্দুর ছেলে—পুজোপাঠ ত সুখের কথা, আজকালকার ছেলেদের ব্যাপার দেখে ত আমার মুখে কথাই ফোটেনি, দিনান্তে ভুলেও একবার ভগবানকে ডাকতে চায় না তারা—এই জন্যেই দেশের এই অবস্থা

—"কৃষ্ণদাস হয়ত বা দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়ার বিষয়ে বেশ গাল-ভরা একটা বক্তৃতা স্ত্রীকে শোনাত কিন্তু স্ত্রী সে স্রোতে প্রচণ্ড বাধা দিল—।

"তোমার লেকচার শুনবার জন্ত আমি কথাটা তুলিনি, ছেলের জন্য বললাম আর তুমি দেশের কথা বলতে আরম্ভ করলে, দেশের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক শুনি—? আরও অনেকদিন কথাটা তুলে দেখেছি তুমি যেন কথাটাকে চাপা দিতে চাও—!" কৃষ্ণদাস কথাটাকে চাপা দিতেই চায়, দেশের সমস্যা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়. কথাকে চাপা দিতে চায় সে, কথাকেই চাপা দেবার জন্য নয়, নিজের মনের উদ্বেগকেই চাপা দেবার জন্য।

"কথাটা যে আমিও ভাবিনি লতা তা নয়, কিন্তু দেবতার কথা, কোন প্রাণে তাকে মানা করি? এতে খোকনের যদি কোন অমঙ্গল হয়! এই ভয়েই শুধু কিছু বলিনি কোন দিন। বাবাও কোন দিন বাধা দেননি—!"

"বাবা যখন বাধা দেননি তখন ও ছোট ছিল, সেটা ছিল ছেলেখেলা—কাঠালপাতার ভোগ দিত—এখন জিনিসটা অন্য আকার নিচ্ছে—পূজোর ব্যাপার বলে আমিও কিছু বলতে পারিনে—কিন্তু তাই বলে—" লতা এখানেই যেন পুনরায় বাধা পায়, যে বাধা যে কোন হিন্দুই পাবে—শুধু হিন্দু কেন, যে কোন ধর্ম্মমতাবলম্বীই পাবে। "আর তা ছাড়া একই মন্দিরে দুটি একই দেবতার পূজো—আমাদের শাস্ত্রে মানা আছে—" কোন শাস্ত্রে এমন নিষেধ আছে কিনা জানি না, লতা ও কৃষ্ণদাসেরও ছিল না কিন্তু নিষেধ করবার কিছু একটা উপায় পেয়ে লতা যেন বাঁচল—কথাটা এমন যুক্তিযুক্ত যে কৃষ্ণদাসের মনেও সেটা প্রতিধ্বনি পেল।

"এটা তুমি ঠিক বলেছ লতু। এটা কিন্তু খুবই অন্যায় হচ্ছে—বাবা এটা

কথনই হতে দিতেন না—তখন ছিল ছেলেখেলা—উঠোনে বারান্দায় করত, এখন ও রীতিমত পূজো করে—খোকনকে এইটাই বুঝিয়ে বল—"

"অতটুকু ছেলেকে আবার বুঝাবে কি। জিনিসটা যখন শাস্ত্রে মানা আছে তখন বন্ধই করে দিতে হবে—" লতা তখনই সমস্যার সমাধান করে ফেলল।

"তাহ'লে তুমি খোকনকে বলে দিও—নেহাৎ না ছাড়ে যদি তবে যেন আমাদের ঠাকুরের কাছেই বসে পূজো করে—কী বল!" তিক্ত কাজ-টুকুর ভার স্ত্রীর ওপর দিয়ে কৃষ্ণদাস স্থানত্যাগ করে, অর্থাৎ কথাটা ভুলতে চায়।

যথাসময়ে বিবেককে কথাটা বলা হয়, কয়েকবার মহড়া দিয়ে লতাই কথাটা তাকে বলে, মার আদেশ শুনে বিবেক বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়।

"কেন মা? আমার পূজো বন্ধ হবে কেন? আমার ঠাকুর কী দোষ করল?"

"দেখ পাগল ছেলের কথা। ঠাকুর কী দোষ করে রে! যদি সব সময় পূজোই করবি তবে লেখাপড়া করবি কখন? লেখাপড়া না করলে জজ হবি কি করে—?"

"আমিত পড়ার সময় পূজো করিনে মা! ঠাকুরকে পূজো না করলে আমি জজ হতেই পারব না—ঠাকুর রাগ করবে যে।" জজ দ্রব্যটি কি বিবেক সম্যক জানত না, তবে মা-বাবার মুখে প্রায়ই শুনে সে ঠিক করে রেখেছিল যে ওটি এমন একটি বস্তু যেটা সাধারণতঃ দেখা যায় না - এবং বিবেককে সেখানেই পৌঁছতে হবে।

"এক মন্দিরে পূজো দুটো করা মহাপাপ খোকন, ওতে ঠাকুর ভয়ানক রাগ করেন—ওতে সব পাপ হয়—মা মরে যায়—!"

"কে বলল মা ? বাবা ত কিছু বলে না—আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করব ত! কাকাবাবুকে, মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করব—" পাপ হওয়া এবং মার মৃত্যুকে বিবেক এখন বড় ভয় করে, ও দুটোর ভয়ে বিবেক যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারত, মৃত্যু কি বিবেক সম্যক না জানলেও এখন এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে দাদু ও ঠামুর অনুপস্থিতির জন্য এই জিনিসটিই দায়ী!

"কাকাবাবু, মাষ্টার মশায় কী দরকার—শুনি ? উনি কী কিছু কম জানেন—না হয় কাকাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখিস—"লতা তখনই মনে মনে স্থির করে নিল যে সুরোর বাবাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে শিখিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু স্কুলের শিক্ষক পর্য্যন্ত সে পৌছতে পারবে না—বিবেকের কোন সমস্যা উপস্থিত হ'লেই তার সমাধানের জন্য তার জনৈক প্রিয় শিক্ষক ও সরস্বতীর পিতার শরণাপন্ন হওয়া অনিবার্য্য ছিল, এত বড় সমস্যা বিবেকের জীবনে আর কখনও আসে নাই।" ঐত উনি এলেন, জিজ্ঞেস করে দেখ না।"

"হ্যা বাবা সত্যি ? এক সঙ্গে দুটো পূজো করলে নাকি পাপ হয়—মা মরে যায়—?" কৃষ্ণদাস কোথা থেকে এসে ভিতরে প্রবেশ করেই এই বিপদের সম্মুখে পড়ল, অকস্মাৎ সে যেন একটা উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের সম্মুখে পড়ল—। অদূরে দাঁড়িয়ে লতা, তার মুখের দিকে সাহায্যের জন্য তাকিয়ে কৃষ্ণদাস দেখল যে সে চোখ টিপে সম্মতি জানাতে বলছে। বল না বাবা তুমি চুপ করে আছ যে—!"

"হ্যাঁ বাবা, ওটা ঠিক করতে নেই—মানে হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাপ হয় বই কী—!"

"তাহলে আমি পূজো কর্ব্বো না—? কালকে আমার ঠাকুরকে জলে ভাসিয়ে দেব—?" বালকের চোখ ছলছল হ'য়ে উঠল।

"না বাবা তা কেন করবে! তোমার ঠাকুরকে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিও—তুমি না হয় আমাদের ঠাকুরের সামনে বসে রোজ প্রণাম করো—আমার পূজা দেখো—আলাদা পূজো না করলেই হ'ল—কী বলো গো—?" কৃষ্ণদাস একটা পথ খুঁজবার চেষ্টা করে। এটাতে লতা সম্মতি না দিয়ে পারে না।

"আচ্ছা—" নতমুখে বিবেক সে স্থান ত্যাগ করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে শুধু পরস্পরের মুখে তাকাল—নির্ব্বাক ভাষা বিনিময় করে দুজনে দুদিকে চলে গেল।

তখন বেলা অপরাহ্ন—সূর্য্য তখন বিশ্বদেবতার রূপ ধারণ করেছে, পৃথিবী তার সন্ধ্যারতির আয়োজনে ব্যস্ত, দিকদিগন্তে বর্ণচ্ছটা!

গৃহদেবতা রাধামাধবের সান্ধ্যপূজার আয়োজন হল, দীপ জ্বলল দেবতার সম্মুখে, ধূপে সুগন্ধ মন্দিরের আবহাওয়া, দেবমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত বৃহৎ ঘৃতের প্রদীপের শিখায় তাঁর মুখ আলোকিত হ'ল, নৈবেদ্য সাজান হ'ল দেবতার সম্মুখে—যথারীতি সান্ধ্যপূজার ব্যবস্থা। অদূরে বিবেকের দেবতার ক্ষুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে সেদিন কোন ব্যবস্থাই হ'ল না, দীপ জ্বলল না, ধূমায়িত হল না ধূপের গন্ধ, নৈবেদ্যর কোন ব্যবস্থাই হ'ল না—পূজারীরও দর্শন পাওয়া গেল না সেখানে।

বিবেক তখন নিঃশব্দে বসেছিল বাহিরের বারান্দায়—একাই ছিল সে, হয়ত বা তার মুখের ও মনের অবস্থাও তার ছোট দেবতার মতই আলো-হীন,—সে ভাবছিল যে আজ থেকে তার ঠাকুর অভুক্তই থাকবে, স্নান হবে না, যথা সময়ে নিদ্রাভঙ্গ করান হবে না, রাত্রে শয্যা গ্রহণের জন্য

অনুরোধ না করাতে নিশ্চয়ই তিনি নিদ্রা যাবেন না, অর্থাৎ আজই রাত্রে কিংবা কাল দুপুরের পর ঠাকুর নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে চলে' যাবেন—সুতরাং বিবেক বহুক্ষণ চিন্তার পর ঠিক করল যে কাল ঠাকুরের বিসর্জ্জনই দিতে হবে—" পিতার বা মাতার নির্দ্দেশানুযায়ী ঠাকুরকে অভুক্ত রেখে নিজের শোবার ঘরে পুতুলের অবস্থায় রাখার কোন অর্থই হয় না; বিসর্জ্জনের পর দেবতা স্বর্গে যান এই দৃঢ় বিশ্বাসই বিবেকের মনে ছিল, সুতরাং সে পথে বাধা দেওয়া তার একেবারেই ঠিক হবে না।

নিঃসঙ্গ বিবেক বারান্দায় বসে আকাশ-পাতাল চিন্তাই করে চলেছিল, তার সম্মুখে বাগানের সম্মুখের পথে গো-পাল ঘরে ফিরে চলেছে—ছেলে মেয়েরা বাড়ী চলেছে, আকাশে বলাকাশ্রেণী তাদের যাত্রার ছন্দপতন করে' উড়ে চলেছে পশ্চিমের দিকে—তাদেরও দেরী হয়েছিল।

"বিবুদা, সন্ধে উৎরে গেল যে, এমনি গালে মুখে হাত দিয়ে বসে আছ যে—আজ কী পূজো টুজো হবে না কি—?" সুরোর কথায় বিবেকের বিন্দুমাত্র ধ্যান ভঙ্গ হ'ল না; ওঃ, রাগ হয়েছে বুঝি? সত্যি আজ আমার দেরী হ'য়ে গেছে, কী করব বল, চুল বেধে গা'টা ধুয়ে আসতে আসতে দেরী হ'য়ে গেল—আচ্ছা তুমি এসে কাপড় ছেড়ে নাও, আমি এক মিনিটে পূজোর যোগাড় করে দিচ্ছি—কই ওঠ।" সুরো বুড়ী এত কথাগুলো বলে বিবেকের হাত ধরে টানতে তার ধ্যানভঙ্গ হল—।

"কে সুরো—তুই এসেছিস—! আজ থেকে আমার পুজো বন্ধরে—তোকে আর যোগাড় দিতে হবে না।"

"পুজো বন্ধ? কেন বিবুদা? ছিঃ ও কথা মুখে আনতে নেই পাপ হয়—!"

"না রে সত্যি বন্ধ!—" বিবেক সুরোকে পূজা বন্ধের ইতিহাস শুনাল,

কিশোরী বালিকা সে কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, ভাল মন্দের বিচার করবার ক্ষমতা তার ছিল না, সে এই ভেবে মর্ম্মাহত হ'ল যে বিবেকের প্রধান কার্য্যটুকু করবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'ল। কোন প্রতিবাদ না করে' সুরো ধীরে ধীরে ভিতরে গিয়ে মন্দিরের বারান্দা থেকে দরজার কাছ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল যে ভিতরে রাধামাধবের সম্মুখে বসে কৃষ্ণ-দাস যথারীতি পূজার্চ্চনা করছে, তার পাশে বসে লতা নিপুণ হাতে আয়োজন করছে, অদূরে বিবেকের ও তার ঠাকুর বিবেকের মতই বিষণ্ন মুখ করে' অর্দ্ধ আলোতে দাঁড়িয়ে আছেন—সব দেখে সুরোর দুচোখ ফেটে জল এল, সে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ না করে, কৃষ্ণদাস কিংবা লতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে সুরো পুনরায় ফিরে এল বিবেকের কাছে—।

"বিন্দা—তোমার পূজোই বন্ধ হ'ল, জেঠামশাইদের পূজো ত হচ্ছে—তুমি একবার ভাল করে জ্যেঠিমাকে বুঝিয়ে বল না,—তুমি কিছু বলবে না—কিছু না—!"

এবার বিবেক তার ধৈর্য্য হারাল, বিনা বাক্যব্যয়ে সুরোর গালে এক চড় বসিয়ে দিল, সুরো হতভম্ভ হ'য়ে বিবেকের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুর মত কেঁদে উঠল, এবং কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ী চলে গেল!

বিবেক তার দিকে ফিরেও তাকাল না। অন্য সময় হ'লে কারণে বা বিনা কারণে সুরোকে মেরে বিবেক দুঃখীত হয়, যতক্ষণ রাগ থাকে ততক্ষণ ভ্রূক্ষেপ করে না বটে কিন্তু রাগটা নিস্তেজ হলে নিজেই সুরোর বাড়ীতে গিয়ে আদর করে ডেকে আনে। সুরোর তখন অভিনয়ের পালা আরম্ভ হয় মাত্র। বহুক্ষণ বিবেকের কথার উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে।

"কী! কথা বলছিস না যে? দেখচি ফের লাগাব এক চড়? চড় না খেলে কথা বের হবে না—।"

"মেরেই দেখনা—বড় চড় মারতে এসেছেন লাট সাহেব।'

"এই দেখ—চড় না মারতেই কথা বেরল দেখলি? আর একটা যদি মারতে পারতাম তবে দেখতিস মুখে খই ফুটত!" তারপরই দেখা যেত যে দুজনে হাত ধরে বিবেকের বাড়ী যাচ্ছে। এ দৃশ্য প্রায়ই ঘটে।

কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হ'ল! সুরো কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবার পর বিবেকের মনে সে বিষয়ে কিছুমাত্র রেখাপাত হ'ল না।

কিশোর বিবেক তখন ধ্যানমগ্ন।

তার পরদিনও বিবেকের ঠাকুরের পুজা হ'ল না, এমন কি বিবেক পিতামাতার ইচ্ছানুযায়ী গৃহদেবতা রাধামাধবের সম্মুখে বসেও পূজা করল না, সে ব্যাপারটি কৃষ্ণদাসও লতার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—!

"খোকনকে বললাম আমাদের ঠাকুরের সামনে বসে পুজো করতে তাওত করলনা গো—রাগ করেছে বোধ হয়, দু একদিন থাকবে এ রাগ তারপর নিজেই করবে কি বল।"

"না করে ত তুমি আর খুঁচিওনা ওকে। ছেলের পূজাপাঠের ঘটা দেখে আমার কিছু ভাল লাগে না বাপু। ওর জন্মরাত্রের সেই ঠাকুরের কথা মনে পড়ে: আমার মনটা বড় দমে যায়! তুমি আর কিছু বলো না যেন।" লতা স্বামীকে সতর্ক ক'রে দেয়।

"নাঃ, আমার কী দরকার।" কৃষ্ণদাস নির্লিপ্ত উত্তর দিয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করে। ঠিক এই সময়ে বিবেক সকালের পড়া শেষ কার' ভিতরে আসে স্নান করবার জন্য; দৈনন্দিন ব্যবস্থানুযায়ী স্নান করে স্কুল গেল।

অন্য দিন বিবেক স্কুলে যাবার সময় সুরোকে তার বাড়ী থেকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে যায়, সেদিন সে ব্যবস্থার অন্যথা হ'ল। বিবেক স্নান শেষ করবার পর খেতে বসবার সময় লতা একবার বলল—

"খোকন, চান করে' পূজো করবিনে? যা না, ঠাকুরের সামনে একবার প্রণাম করে আয়—!" স্বামীকে নিষেধ করে' প্রথম অনুরোধ লতাই করল, নারীর মনের বৈশিষ্ট্য এখানেই।

"ঠাকুর কোথায় মা। ঠাকুরত নেই।"

"ওমাঃ, সে কি কথা! ছেলে বলে ঠাকুর নেই! আমাদের ঠাকুর কী হ'ল?"

"আমার নিজের ঠাকুর ত নেই। অন্যের ঠাকুরকে আমি পূজো করব না! দাও আমাকে ভাত, ইস্কুলের দেরী হচ্ছে—!"

"তাইবলে' তুমি প্রজো আর করবিনে—?"

"না মা, পূজো আমি ছেড়ে দিলাম—!"

পুত্রের কথার কোন উত্তর না দিয়ে লতা তাকে ভাত দিল।

সেদিন বিবেক একাই স্কুলে গেল, সুরোকে বাড়ী থেকে ডেকে সঙ্গে ত নিলই না, স্কুলেও তার সঙ্গে দেখা করল না বা কথা বলল না।

অপরাহ্নে অন্যান্য দিনের মত বিবেক কোথাও যাওয়া বন্ধ করল এমন কি সুরোর বাড়ীতেও গেল না, পূর্ব্বদিনের মত স্তব্ধ হ'য়ে বাইরের বারান্দায় বসে থাকল।

সম্মুখের পথ ধরে বিবেকের বয়সী ছেলে মেয়েরা খেলতে গেল, পিন্টু, মন্টু, খোকা, নারাণ, বিকাশ সকলেই গেল, যাবার সময় কেউ কেউ তাকে দু একটা ডাক দিল অবশ্য ফটক পার হ'য়ে বিবেকদের বাগানে না ঢুকেই, কেউ বা শুধু বার বার তাকিয়েই গেল, আহ্বান কিংবা দৃষ্টি

আহ্বান কোনটারই উত্তর বিবেক দেয় নাই, হয়ত সকলের আহ্বান সে শুনতেও পায়নি ; সাধারণতঃ সে এমন করে না ; সেদিন গ্রামের হাট-বার ছিল ; সোনাপুর হাট দশখানা গ্রামের প্রধান হাট, বহুদূর থেকে ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় রাত দশটা পর্য্যন্ত সোনামুখীর তীরের কলম-বাগানকে চঞ্চল করে রাখে, হাটের প্রতিবিম্ব, চিৎকারের প্রতিধ্বনি আলোর প্রতিচ্ছবি সোনামুখীর বুকে থর্ থর্ করে' কাঁপে! সেদিনও বিক্রেতারা বাঁশের বাঁকে পণ্য রেখে দ্রুত চলেছিল, বাঁকের দোলার ছন্দে নিজের পায়ের ছন্দ পড়ছিল, দুটির ছন্দের তালে নিজের ডান হাত খানা দুলিয়ে চলেছে। পুরুষ ও নারী বিক্রেতারা তাদের মাথায় বেতের ধামায় বিবিধ পণ্য নিয়ে চলেছিল, বিক্রেতাদের সাথে চলেছে শূন্য পাত্র নিয়ে ক্রেতারা। একই পথে স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে হাটের দিকে যেখানে চলবে বেচাকেনা, পণ্যদ্রব্যের হাত-বদল হ'য়ে সকলেই ঘরে ফিরবে—বিবেক স্থির হ'য়ে বসে সব দেখছিল ; হয়ত তার চিন্তার স্রোত পথের স্রোতের সঙ্গে ছিলনা।

ক্রমে এল গোধূলি, গোপাল পথের ধূলি উড়িয়ে ফিরছিল ঘরে, আকাশে বলাকা-শ্রেণী রূপার রেখায় লেখা লিখে যাচ্ছিল, হাটের দিক থেকে কিছু কিছু লোক ফিরছিল ঘরে তাদের শূণ্য পাত্র ভরে, দূরে তালগাছটার মাথায় রোদ্‌টুকু চিক্ চিক্ করছিল।

সুরো সেই সময় বিবেকদের বাগানের সম্মুখের পথের উপর দুবার যাতায়াত করে বিবেককে লক্ষ্য করল, তাকে একা পূর্ব্বদিনের মত বারান্দায় বসে থাকতে দেখে ফটকের ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না, বিবেক তাকে একবার দেখে দূরের সেই তালগাছটার মাথার দিকে তাকাল, রোদটুকু তখন নিভে গেছে।

বিবেক উঠে ভিতরে চলে গেল। স্বরো তখন নিজের বাড়ী ফিরে গেছে, পথে বিক্রেতারা পাত্র শূণ্য করে ঘরে ফিরছিল।

সেদিনও সন্ধ্যায় বিবেক পূজায় বসল না, কোন ঠাকুরের সম্মুখেই নয়; অর্থাৎ সত্যই বিবেক পূজা বন্ধ করল।

সেই দিন রাত্রে লতা অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল—লতা দেখল যেন তাদের গৃহ-দেবতা রাধামাধব বিবেকের দেবমূর্ত্তি ছোট রাধামাধবের হাত ধরে মন্দির থেকে নেমে আসছেন, তাঁদের সম্মুখে নামছে বিবেক, তিন জনের মুখই বিষণ্ণ, দৃশ্য দেখে লতা তাড়াতাড়ি গৃহদেবতার পদতলে লুটিয়ে পড়ল, পা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদল, প্রত্যুত্তরে গৃহদেবতা নীরবে শুধু পাশের দেবতাকে দেখিয়ে দিলেন। সেই সময়ে লতার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

অথচ আশ্চর্য্য যে ঠিক সেই রাত্রে কৃষ্ণদাসও ঠিক সেই দৃশ্যটিই স্বপ্নে দেখল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দুজনেই স্বপ্নের কথা স্মরণ করে' নিতান্ত বিষণ্ণ হ'য়ে ছিল, কিন্তু দুজনের একজনও অপরকে গতরাত্রের স্বপ্নের কথা বলে নাই। সমস্ত দিন স্বপ্নের স্মৃতি লতাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, মাতৃ-হৃদয়ে সে স্বপ্ন বারবার পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করেছে, অথচ নিজের পরাজয়ের কথা ভেবে স্বামীকে কিছুই বলে নাই, অপরাহ্নে লতার ভয় হ'ল রাত্রি আগমনকে, ভয় হ'ল স্বপ্নের পুনরাবৃত্তির কথা, তার শঙ্কিত প্রাণ চমকে উঠল সে দৃশ্যের শেষটুকু ভেবে—লতা মন্দিরের সোপানেই দেবতার পথরোধ করেছিল সে রাত্রে যদি তাঁরা গৃহত্যাগ করেন? লতা আর সহ্য করতে না পেরে স্বামীকে তার স্বপ্নের কথা বলল, পরাজয়ই স্বীকার করে' অনুরোধ করল বিবেকের ঠাকুরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। লতার সব কথা শুনে কৃষ্ণদাস স্তম্ভিত হ'য়ে গেল; নিজের স্বপ্নের কথা স্ত্রীকে শোনালে লতা পাগলের মত শুধু একবার চিৎকার করে উঠল।

তারপর দুজনে পুত্রকে ডেকে বলল তার ঠাকুরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, লোভ দেখাল সুন্দরতর ব্যবস্থার।

"না মা, আমি আর পূজো করব না। ও আমি ছেড়ে দিলাম।" বিস্মিত বিবেক শেষে বলল।

"ছি! বাবা, বাপমার কথার কি অবাধ্য হ'তে আছে? পৃথিবীর সব বড় বড় লোক বাপমার ওপর ভক্তির জন্যেই অত বড় হ'য়েছিলেন, তুমি ত তাঁদের কথা পড়! তুমি আমার তত বড় লোক হবে—লক্ষ্মি মাণিক!" লতা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল। মার বুকের ভিতরে বিবেকের কান্না পাচ্ছিল, মার বুকেও যেন সে ক্রন্দনেরই চাপা অনুভূতি পাচ্ছিল।

"তুমি কাল থেকে তোমার ঠাকুরের পূজো করো, কেমন?"

"তোমরা মানা করেছিলে কেন?"

"তোমাকে বলেছিলাম আমাদের ঠাকুরের সামনে পূজো করতে—তুমি ত তাও করলে না—পূজো একেবারে বন্ধ করা পাপ বাবা—!"

অবশেষে বিবেক স্বীকৃত হয় তার ঠাকুরের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, যে লতা তাকে নিষেধ করেছিল তারই আপ্রাণ চেষ্টায়, কৃষ্ণদাস দুবারই নির্ব্বাক দর্শক ছিল মাত্র।

স্বীকৃত হ'য়ে বিবেক ছুটে যায় সুরোর বাড়ীতে, সেখানে গিয়ে দেখে সে চুপ করে ভিতরের একটা ঘরে বসেছিল; প্রথমেই দেখা হ'ল সুরোর মার সঙ্গে, সে তখন আঙ্গিনায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম করে' উঠল।

"কাকিমা, সুরো কই? তাকে দেখছিনে"!

"কেরে বিবেক—আয় আয়, এ কয় দিন যে তোর দেখাই নেই যে—আশিসনে যে! কাজের তাড়ায় মরবার ফুরসৎ নেই বাবা যে একবার

খোঁজ নেব, সব ভাল ত—?” সুরোর মা তার কাছে তখন দুদিনের ইতিহাস চাচ্ছিলেন অথচ বিবেক তখন চতুর্দ্দিকে চঞ্চল ভাবে তাকাচ্ছিল। ‘হ্যাঁ ভাল কাকিমা—সুরো এখনও বেড়িয়ে আসেনি? সন্ধ্যে যে ঘোর হ’য়ে এল।”

“ঐ ঘরে আছে বাবা—মেয়ের দুদিন কী যে হয়েছে, মুখে যেন আমাবস্যে নেমেছে—না পড়া না শুনো—কিছু হবে না আর কী!”

কাকিমার হিতোপদেশ শুনবার ধৈর্য্য তখন বিবেকের ছিল না, তার অঙ্গুলির ইঙ্গিত অনুসরণ করে’ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে’ সুরোকে স্বল্পান্ধকারে বসে থাকতে দেখল।

“এই যে ঠাকরুণ! গালে মুখে হাতদিয়ে বসে থাকবার তোমার এই সময়? বলি পড়াশুনো কী চুলোয় গেল? কাকিমা আজ খুব মারবেন আমি বলে দিয়েছি।” বিবেকের কোন কথার উত্তর দেবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ সে প্রকাশ করল না। “কী কথা বলছিসনে যে? লাগাব একটা চড় দেখবি—?” এ ওষুধটুকু মন্ত্রবৎ কাজ করল।

“ইঃ, বড় চড় লাগানেবালা! লাগাও না দেখি! জেঠিমাকে দিয়ে আজ যদি মার না খাইয়েছি—সেদিন কিছু বলিনি তাই—না?” ঘরের ভিতরে উজ্জ্বল আলো থাকলে দেখা যেত সুরোর চোখ দুটো তখন জলে ভরে গিয়েছিল, অন্ধকার তার লজ্জা নিবারণ করল।

এরপর অতীব সামান্যক্ষণে দুজনের ভাব ঠাকুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত প্রতিষ্ঠিত হ’য়ে দুদিনের স্বপ্ন প্রায় ক্ষণিক মিথ্যা আবরণকে উন্মোচন করে দিল। বিবেক তাকে ঠাকুরপূজার পুনর্ব্যবস্থার কথা জানাল সবিস্তারে। “সত্যি বিবুদা? আর বাঁচা গেল বাপু। এ দুদিন আমার সময় যা কেটেছে তা ঠাকুরই জানেন—তোমার পূজোর যোগাড় না করতে পেরে—!”

বিচক্ষণা বুড়ীর মত কিশোরী স্থুরো বিবেককে তার হুদিনের সমস্ত মানসিক গ্লানির কথা শুনিয়ে দিল।

ওদিকে লতা পুত্রের ঠাকুরকে মন্দিরের ভিতরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, তার আয়োজন, পুজার ব্যবস্থাদি পূর্ব্বের থেকে বহুলাংশে ভাল করে দিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে প্রতিদিন বিবেকের ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা করে' তবে গৃহদেবতার পূজার ব্যবস্থা করবে।

পরদিন থেকে বিবেক যথারীতি নিজের ঠাকুরকে পূজা আরম্ভ করল, পাশে বসে স্থুরো পূজার ব্যবস্থা শেষ করে ধূপদানিতে ধূপ দিয়ে গন্ধ ছড়িয়ে দিত মন্দির ময়।

পূজার ধূপের আড়ালে, ধুপের গন্ধে এই হুটি বালক বালিকার ক্রমপরিণতি হ'তে থাকল, কী উদ্দেশ্যে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আমরা আশা করি পরিপূর্ণতার দিকে। কৈশোরের খেলা, পূজা, পড়াশুনা, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতম কার্য্যাবলীকে কেন্দ্র করে' স্থষ্টির শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সুন্দর একটি কাহিনী রচিত করবার চেষ্টা করেন; অনেকে হয়ত বলবেন যে কাহিনীর স্থত্রপাতের সময় লেখক জানেন তার শেষ পরিচ্ছেদ, কাহিনীর নায়ক নায়িকার পরিণতি, কিন্তু সেটা ভুল, পৃথিবীর লেখকরা যদি তাঁদের কাহিনীর ইতিহাস বলেন তবে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন; পর্ব্বতশিখর থেকে স্রোতস্বিনীর ক্ষীণতম ধারা আত্মপ্রকাশ করে, আপনি বলতে পারবেন না তার শেষ পরিণতি কোথায় এবং কি ভাবে, কোন দেশ, কোন প্রদেশ, কোন জনপদ বিধৌত করে সে যাবে, আত্মনিমজ্জন করবে সাগরে কিংবা বৃহত্তর নদীতে, হদে কিংবা পর্ব্বত-গহ্বরে! তার এই অজ্ঞাত পরিচয়টুকুই তার পরিণতির বৈশিষ্ট্য!

লোকে বলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, পৃথিবীর প্রতি ঘটনার আদি ও অন্ত তিনি

আদিতেই জানেন ; ঈশ্বরের যে পরিচয় আমরা শাস্ত্রে, সংস্কারে, বৃদ্ধ বৃদ্ধার বচনে, ভিত্তিহীন কাহিনীতে শুনে আসছি তাতে আমারও বিশ্বাস একই প্রকার হয়েছে, কিন্তু আমার এই ইচ্ছা করতে স্পৃহা হয় যে পৃথিবীর বিখ্যাত নরনানীর কাহিনীর আদিতে তার অন্তের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বরও থাকেন অজ্ঞ, সেই জন্য তাদের কাহিনীর পরিণতি, প্রতি পরিচ্ছেদ এমন সুন্দর, এমন রসময় হয়।

বিবেক ও সরস্বতীর কাহিনী এই প্রকার রসময় হ'য়ে উঠুক এই আমার প্রার্থনা সরস্বতীর কাছে।

পৌষপূর্ণিমায় সোনাপুরের বুকে সোনামুখীর তটে একটা মেলা বসে, মেলাটি এক সপ্তাহ থাকে ; সোনাপুরের প্রধান গ্রাম থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে সোনামুখীর তীরে একটি প্রাচীন বটগাছ আছে, বয়েস নির্ণয়ে লোকে অনেক কিছু বলে, কেউ বলে বটগাছটি দুশ বছরের, কেউ বলে পাঁচশ, অনেক প্রাচীন লোক এতদূরও বলেন যে স্বয়ং মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে উন্মাদের মত যখন সারা সৃষ্টি প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন তিনি নাকি এই বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছিলেন—! বর্ত্তমান চেহারায় সে সবের কোন পরিচয় না পাওয়া গেলেও তার প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করা যায়। সোনামুখীর তটে বিশাল মহীরুহ বিশালতর ভূখণ্ডকে আচ্ছাদিত অন্ততঃ দুশ বছরের অতীত দিনের সাক্ষ্য যে সে দিতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিবিধ প্রকারের জটাজুট মাটির বুকে প্রোথিত করেছে হয়ত বা এক একটি যুগের সাক্ষ্য হিসাবে—তার অর্দ্ধেক প্রাচীন শাখা প্রশাখা নদীর বুকের উপর এগিয়ে গিয়ে তাকে যেন তার পথ দেখিয়ে দিচ্ছে, নদীর বুকে জটাজুট নেমে এসে তাকে ইঙ্গিত করছে অন্তরের বাণী শুনবার জন্য, তবে আমি এই সুবিধাটুকু

দেখেছি যে সে সব জটা ধরে ছেলেরা দোল খায়, দোল খেতে খেতে নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ে' তার অন্তরের গুপ্ত তরঙ্গকে ব্যক্ত করে তোলে, শান্ত-শিষ্ট ছেলেরা সহজে সেখানে অবশ্য যায় না, তার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ আছে।

প্রাচীন বটবৃক্ষের তলে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরটির নাম শ্মশানেশ্বরের মন্দির, তার বাহিরের পরিচয় বৃক্ষের মতই প্রাচীন, ভাল ভাবে দেখলে বোঝা যায় যে সেটি সুনির্ম্মিত, বহিরাবরণের পরিচয়ে প্রাচীন যুগের স্থাপত্য-শিল্পীর উৎকর্ষতা পাওয়া যায়, মন্দিরটি ইঁট কিংবা পাথরের তৈরী বুঝা কঠিন, সে বিষয়ে বহুজনের বহুমত, এখন ব্যাপারটা অনেক-খানি ঐতিহাসিকের আবিষ্কারের পর্য্যায়ে পড়ে গেছে; বর্ণ বোধ হয় এককালে সাদাই ছিল, হয়ত একদিন তার নাতি উচ্চ চূড়াটির শ্বেত ইঙ্গিত নীল আকাশের বুকে শুভ্রকান্তি মহেশ্বরের বিরাটত্বের দিকেই প্রসারিত ছিল—কিন্তু এখন সে ইঙ্গিত আছে বটে কিন্তু বর্ণ লোপ পেয়েছে, কালের কালিমা তার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করেছে, পিচ্ছল করেছে তার দেহ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছোট বড় বটগাছ আত্মপ্রকাশ করেছে, ভেদ করতে পারেনি, এ যুগের মন্দির হলে হয় ত বা তার অস্তিত্ব পাওয়া যেত কয়েকখানা ইঁটের টুকরায়।

মন্দিরের ভিতরে একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ আছে, নাতিপ্রসার ঘর, যেমন অন্ধকার তেমনি ঠাণ্ডা; একটিমাত্র দ্বার, হয়ত এ যুগের কারণ সেটি কাঠের, দ্বারটি প্রায়ই বন্ধ থাকে। এই মন্দিরে একজন সন্ন্যাসী থাকেন, মন্দিরের মতই যেন প্রাচীন, কত বয়েস কেউ বলতে পারে না, কোন জাতি তাও অজ্ঞাত, বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু সংস্কৃত সব রকম ভাষাই অনর্গল বলতে পারতেন, বৃদ্ধরাও নাকি তাঁদের কৈশোর থেকে তাঁকে

সেই প্রকারই দেখছেন—থাকেন থাকেন আবার দু এক মাসের জন্য কোথায় যেন চলেন যান, আবার ফিরে এসে মন্দিরে বাস করেন, ভিক্ষায় বের হ'ন না, কি ক'রে জীবন ধারণ করেন লোকে জানে না, কেউ বলে তিনি বায়ুভূক্, সেটা অবশ্য ঠিক নয়; পশ্চিমের দিকে কিছুদূরে ঐ যে গোয়ালটোলাটি, সেখান থেকে তাঁকে গোয়ালরা দুধ ও ফল দিয়ে যায় অর্থাৎ মন্দিরের দেবতাকে পূজা দেয়। তবে তাঁর একটা নির্দ্দেশ ছিল যে সপ্তাহে একদিন—শনিবারে—মাত্র তারা আহার্য্য দিতে পারবে, বেশী নয়—! তারা বলে মাত্র ঐদিন দেবতারও পূজা হয় এবং তিনিও আহার করেন, বাকি ছয় দিন দেবতা ও পূজারী উপবাসী থাকেন।

এই সন্ন্যাসীর সেদিন মৃত্যু হ'ল—সে এক আশ্চর্য্য মৃত্যু! সেদিন শনিবার, প্রভাতে কয়েকটি গোয়ালা তাঁর পূজার দুধ ও ফল দিতে এসে দেখে যে সন্ন্যাসীর দেহ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে নিশ্চলভাবে যোগাসনে বসান, মন্দিরের দুয়ারে একটি বৃহৎ পুরাতন কুলুপ লাগান।

অনেক অন্বেষণ করেও তার চাবি কোথাও পাওয়া যায় নাই।

তারপর থেকে সেই মন্দিরের দ্বার বন্ধই আছে। অন্য সন্ন্যাসীও আসে না, দ্বারের তালা খুলবার সাহসও কারো হয় নাই। দেবতার পূজা অর্ঘ্য দ্বারের সামনে লোকে রেখে যায়—দেবতা খান, পরে সেগুলো নাকি একটি শৃগাল এসে সকলের সম্মুখে খেয়ে যায়।

মন্দিরের অনতিদূরেই একটা শ্মশানঘাট আছে।

এই মন্দিরের সম্মুখে যে বৃহৎ মাঠ পড়ে আছে সেই মাঠেই মেলা বসে; পৌষপূর্ণিমার দিন থেকে এক সপ্তাহ কাল এই মেলা বসে আসছে বহুদিন থেকে, এই দিনে কেন বসে কেউ জানে না, এর বিষয়েও নানা মতবাদ

আছে—অনেকে বলে সেই দিন নাকি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেকে বলে এই দিনে সেই সন্ন্যাসী প্রথম মন্দিরে আসেন।

পৌষপূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান পুণ্য অর্জ্জন করে, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা বহু দূর-দেশে গঙ্গাস্নান করতে যায়—অনেকে এই মন্দিরের নীচে সোনামুখীতেই স্নান করে' মন্দিরে পূজার্ঘ দেয়—তারা বলে—"মন চাঙ্গা ত কাঠে গঙ্গা—!" মেলাটি সে অঞ্চলে বেশ বড় মেলা, দেশ বিদেশ, দূর বহুদূর থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর সওদাগরেরা তাদের দোকান নিয়ে আসে, সপ্তাহ-কাল পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে' বেশ দু পয়সা লাভ করে যায়—সোনাপুরের ও অন্যান্য গ্রামের সচরাচর দুর্লভ জিনিস সেই মেলাটি সরবরাহ করে। সোনাপুরের জমিদারই এই মেলার অধীশ্বর।

সাধারণতঃ গ্রামের মেলা বলতে চোখের সম্মুখে যে পরিচয় ভেসে ওঠে এটি সে রকম নয়; গ্রামের মেলা বলতে মনে হয় যেন সেটা একটা সুবৃহৎ হাট, বিভিন্ন প্রকারের পণ্যদ্রব্য ও ক্রেতাবিক্রেতার অসংলগ্ন ভিড়, মিশ্রিত কোলাহল, ধূলো-পরিপূর্ণ আবহাওয়া, কেরোসিন আলোর তীব্র ধোঁয়া, প্রতি পদক্ষেপে অদ্ভুত অপরিচ্ছন্নতা। সোনাপুরের মেলা সেরূপ নয়, এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটা দেখা যায় কোন সহরের সখের মেলাতে। এজন্য জমিদারের সুরুচিকে ধন্যবাদ। পৃথক পণ্যদ্রব্যের একটি বা দুটি দীর্ঘ সারি, মাঝখান দিয়ে পথ দুধারে তার একই জিনিসের দোকান মুখোমুখি স্থাপিত, একটি কোন দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগকে ওখানে পট্টি বলে—এইভাবে বাসন পট্টি, খাবার পট্টি, জুতো পট্টি, মনোহারী পট্টি, বাক্স পট্টি, চামড়া পট্টি, কাপড় পট্টি, গরম কাপড় পট্টি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিচিত্র জিনিসের পট্টি—!

মেলায় প্রবেশের যে প্রধান ফটক সেটার বুক চিরে' একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা

চলে গেছে মেলার বুক পর্য্যন্ত, সেখানে ইঁট দিয়ে ঘিরে' একটি স্থানকে পার্কের মত তৈরী করা হয়, তার বুকে একটি খুঁটির মাথায় রাত্রে একটি আলো তীব্র তেজে জ্বলে; সেই পার্কটিকে কেন্দ্র করে' চারদিকে চারটি পথ চলে গিয়েছে, প্রত্যেকটির দুদিকে দোকানের শ্রেণী, সেই পথগুলি থেকে আবার অন্যান্য পথ তাদের দুধারে দোকানের শ্রেণী নিয়ে প্রসারিত হয়েছে। মেলার একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র একজিবিসন্, অন্য প্রান্তে যাত্রা নাটকের সুনির্দ্দিষ্ট স্থান, কিছু দূরে অপর প্রান্তে পশু গবাদি ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থান—।

স্থাপনের ব্যবস্থা অতীব সুন্দর।

পথে ধূলো নাই, জমিদারের ব্যয়ে গরুর গাড়ীতে দিনে দু তিন বার পথে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে—জমিদারের চেষ্টায় মেলার জন্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর ও থানাও বসে।

প্রতি পট্টিতেই লোকের ভিড়, কোলাহল, চঞ্চলতা, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিযোগিতা; সকাল আটটা নয়টা থেকে আরম্ভ করে' রাত্রি নটা দশটা পর্য্যন্ত এই ভিড় ক্রমাগত থাকে নদীর স্রোতের মত, তার পর নাটক পট্টির দিকে কিছু ভিড় অগ্রসর হ'য়ে শান্ত ও স্থির হয় প্রভাত পর্যান্ত। এক একটি দ্রব্যের পট্টিতে এক এক প্রকারের ভিড়, কোলাহল পর্য্যন্তও যেন এক এক প্রকারের, পট্টি বিশেষের কোলাহলের সুরই যেন তার নিজস্ব। কোন পট্টিতে বেশী মেয়েদের ভিড়, কোন পট্টিতে বেশী শিশুর ভিড়, কোন পট্টিতে যুবকের, কোন পট্টিতে বৃদ্ধের, কোনটায় ভদ্র আবার কোনটায় চাষার ভিড়। পথে পথে চাকার উপরে স্থাপিত ছোট ছোট দোকানে পান, জাপানী খেলনা, চুলের ফিতে, মাথার কাঁটা, লণ্ঠনের চিমনি, সূচ প্রভৃতি ছোটখাট দ্রব্য সাজিয়ে সমস্ত মেলাটি প্রদক্ষিণ করছে, তাদের কোন

বিশেষ স্থানে স্থিতি নাই, সকাল থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত তারা এইভাবে ফেরি করে, তার কোন জায়গায় গাড়ীটা রেখে হোটেল থেকে কোনদিন খেয়ে নেয় কোনদিন দু চার পয়সার ভাজাভাজি খেয়ে নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের জন্য উপার্জ্জন করে, কোন ফেরিওয়ালা একটি লম্বা লাঠির মাথায় কতকগুলো জাপানী রং-বেরঙের ফানুষ ফুলিয়ে বেঁধে রেখেছে, পাতলা ফানুষ তাদের রংএর ছটা ছড়িয়ে পাতলা সূতায় ভর করে' ফুরফুর করে উড়ছে, যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে নীল আকাশের অদৃশ্য বুকে মিশে যাবার জন্য—তার হাতে কতকগুলো অফুলান ফানুষ, অধিকাংশ তার কাঁধে ঝোলান থলির ভিতরে—একটি ফানুষ নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে; আর তার হাওয়াটা ছেড়ে যখন দিচ্ছে তখন এক পিঁ-ই-ই শব্দ করছে বাঁশীর মত, এগুলোকে বলে বাঁশী ফানুষ, তার দাম একটু বেশী—! সাধারণগুলো এক পয়সায় দুটো—বাঁশী ফানুষ এক পয়সায় একটা। জাপানের ব্যবসায়-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ প্রশংসা এই ফানুষ গুলো। খাবার পট্টিতে খাবারের দোকানে কাঠের সিঁড়ি বসান টুকটুকে লাল শালুর ওপর, সিড়ি গুলোও শালুর দ্বারা আবৃত তার উপরে চকচকে পিতলের থালায় বিবিধ প্রকারের ও বর্ণের খাবার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়ার মত চূড়াকৃতি ক'রে সাজন—দোকানের সম্মুখে রং ওঠা সবুজ রং করা লোহার চেয়ারে ক্রেতার ভিড়, পিছনে জ্বলন্ত বৃহৎ চুলিতে প্রকাণ্ড কড়াইয়ে তপ্ত ঘিয়ের ধোঁয়া, তার পাশে বিরাট কাঠের পরাতে বৃহৎ এক তাল ছানাকে একজন লোক ক্রমাগত দুহাতে মুঠি দিয়ে ঠেসে চলেছে—দোকানের সম্মুখে কতকগুলো কুকুর ও দরিদ্রের নগ্ন ছেলেমেয়েরা আহাররত ক্রেতার প্রতি গ্রাসটিকে হাত থেকে মুখ পর্য্যন্ত লোলুপদৃষ্টিতে অনুসরণ করছে—বিক্ষিপ্ত পাতাটির জন্য মারামারি করছে।

লোকের ভিড় সর্ব্বত্র, প্রতি পট্টিতে ক্রয় ও বিক্রয়ে, দর্শকে বা তস্করে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবকযুবতী, শিশু কিশোর ও কিশোরীতে সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত প্রতি পদক্ষেপ চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর হ'য়ে ওঠে—বিবিধ রংএর ফানুষ নিয়ে আকাশের বুকে ছেড়ে দিচ্ছে—কতকগুলো কিছু উপরে উঠে ফাটছে ; কিছু কাড়াকাড়িতে ফাটছে—এক প্রকার গ্যাস ভরা ফানুষ দুলে দুলে উঠে যাচ্ছে উপরে ধীরে ধীরে, ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশের বুকে। যারা ফানুষ কিনে উড়িয়ে দিচ্ছে তারা কিছু শিশু, অধিকাংশ নববিবাহিতা বধূ !

সেদিন একখানা গরুর গাড়ীতে চড়ে বিবেক, তার বাপ মা ও সুরো ও তার বাপ মা মেলা দেখতে এল ; সোনাপুরে এমন এক ঘরও গৃহস্থ থাকে না যারা অন্ততঃ পক্ষে এক দিনও মেলা দেখতে আসে না, সারা বৎসরে দৈনন্দিন জীবনের যা কিছু টুকিটাকি জিনিসের অভাব দেখা যায় সেগুলোর প্রয়োজন মিটান হয় এই মেলা থেকে। হিন্দু যেমন বৈশাখ মাস থেকে তার কোন জিনিস পূজায় কিনবে বলে' রেখে দেয়, সোনাপুরে গৃহস্থরা তেমনি মেলার দিকে তাকিয়ে দিন গুণতে থাকে। রাধামাধব বেঁচে থাকতেও এই দুই পরিবার একই সঙ্গে মেলায় আসত তবে তখন দুটো গরুর গাড়ী লাগত, এখন একখানাতেই হয়—। লম্বা ধরণের গরুর গাড়ী, গাড়োয়ানের পিঠের কাছে বিবেক ও সুরো বসে অবিশ্রান্ত কথা বলে চলেছে, পথের পথিক, দুপাশের খাল বিল গাছপাতাকে কেন্দ্র করে', মেলায় কি কি জিনিস কিনবে তার সম্পর্কে, কতক্ষণ থাকবে, কোন কোন পট্টি দেখবে, কোন নাটক ম্যাজিক দেখবার জন্য বাবাকে অনুরোধ করবে—ইত্যাদি সহস্র গল্প, কৃষ্ণদাস ও ভূতনাথ তাদের পিছনে বসে নিজেদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে' গল্প করে চলেছে—কোন্ মাঠের কোন্

জমিটায় এবার কেমন ফসিল হ'য়েছে, কৃষ্ণদাস যে নতুন জমিটা জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নিতে চাচ্ছে সেটার কত সেলামী দেওয়া যেতে পারে, তার বিষয়ে ভূতনাথের মন্তব্য, আর একজোড়া ভাল বলদ না কিনলে তার বেশ অসুবিধা হচ্ছে, দুজনেই বাড়ীতেই পাকা দালান দিয়ে ফেলবে কিনা তার পুনরালোচনা, পাকা দালান হ'লে আগুন আর চোরের হাত থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, একসঙ্গে ইঁটে ভাঁটা পোড়ালে সস্তা হবে না সহর থেকে চিমনির ইঁট কিনে আনলে সস্তা হবে তার হয়ত সহস্রতমবার গবেষণা—গ্রামের স্কুল, জমিদার ও তার কর্ম্মচারীরা, বৃদ্ধ আশুতোষ, রামহরি, সত্য, নৃপেন প্রভৃতি লোকের নানাবিধ আলোচনা—! তাদের দুজনের পশ্চাতে প্রথমে বসে লতা তার পশ্চাতে সুরোর মা—গ্রাম্য সম্পর্কে বিবেকের বাবা সুরোর মার ভাসুর হয়, সুতরাং যথাসম্ভব আড়াল রেখে ও কণ্ঠস্বরকে চেপে দুই বধূতে তাদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, কোন্ কোন্ বাসন কিনতে হবে, নতুন কয়টা, পুরোন বাসন বদল দিয়ে কয়টা, মসলা কিছু কিনে নিতে হবে, মেলায় নাকি প্রত্যেক মশলাই দু এক পয়সাই সস্তা—একটা পয়সাই বা কে দেয়। গ্রামের নবীন দোকানদার! বাবাঃ একেবারে দিনে ডাকাতি করে! কাপড় চোপড় কিছু কিনবে কি না তার আলোচনা, মন্দিরের কোন বাসন কিনতে হবে কি না তার বিষয়ে মনে করা, পাড়ার কোন্ মেয়ের পাকা দেখা কবে, কোন্ বউএর এই কয়মাস হ'ল—প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনা।

গাড়ীর চালক কি ভাবছে বলতে পারি না, মাঝে মাঝে শুধু গরু দুটির প্রতি অবোধ্য ভাষায় ইঙ্গিত করে চলেছে,—লেজে মোচড় দিচ্ছে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তলপেটে খোঁচা দিচ্ছে যখন তখন তারা

ছুটছে, কি ভাবছে তারা তাও বলতে পারব না, শুধু মুখ দিয়ে ফেনা পড়ে', গাড়ীর পিছনে ধূলো ওড়ে।

গাড়ী এসে মেলায় পৌঁছে যায়; গ্রামের বহু গাড়ী একত্র একই স্থানে আশ্রয় নেয়, বলদকে খুলে সম্মুখে তাদের আহার্য্য দিয়ে গাড়োয়ানরা একসঙ্গে মেলা দেখতে যায়, আরোহীরা নিজের ইচ্ছামত পট্টি ঢুকে পড়ে। প্রথমে কৃষ্ণদাস ও ভূতনাথ নিজের নিজের জিনিস কিনতে আরম্ভ করল,—ঘোড়ার জিন রেকাব, দুটো লাঙ্গল, লাঙ্গলের কয়েকটা বাড়তি ফাল, একজোড়া ভাল বলদ ইত্যাদি সংসারের, জমিজমার ও শেষে নিজের সখসৌখিনের দ্রব্য,—তাদের জিনিসগুলো কিনতে কিনতে বেলা কিছু গড়িয়ে গেল, তখন তারা সকলে এসে বসল একটা খাবারের দোকানে, মুখ হাত ধুয়ে সেখানে বসে গেল আহারের ব্যবস্থায়, প্রথমে পুরুষ দুজন ও বিবেক সুরো খেয়ে'নিল, তাদের খাওয়ার পর মেয়েরা তাদের দিকে পিছন ফিরে বসে যথাসম্ভব আড়াল দিয়ে খাওয়া শেষ করল; মেলায় এই খাওয়াটা বিশেষ আনন্দের একটি অঙ্গ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ থেকে প্রতি বৎসর প্রতি মেলাতেই এই খাবারের বিরুদ্ধে, মেলায় এই খাওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালান হয়—মেলায় এইভাবে খাওয়াতেই নাকি নানা প্রকারের ব্যাধি প্রচারিত হয়—ইত্যাদি, ইত্যাদি—! সব মানি, স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে, দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম তথ্যর দিক থেকে এই নিষেধগুলি খুবই ভাল, এই অভিযানের সপক্ষে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রিপোর্ট চলে যায় কলেরায় মৃত্যুহার স্থানীয় লোকাল বোর্ডে, সেখান থেকে সহরের ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডএ, সেখান থেকে কালেক্টার হ'য়ে, ডিভিসন হয়ে লাটের দপ্তর হ'য়ে বড়লাটের দপ্তরে—সেখানে বছরের পর বছর প্রতি জেলায় মেলায় মৃত্যুর হার লিপিবদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। যেন মেলায় খাবার খেয়ে

লোকই শুধু মরে, পৃথিবীর অন্যান্য লোকগুলো অমর। মূর্খদের বিরা-
প্রতিপাদ্য! বড়দের দপ্তরে যারা এই মৃত্যুর হার নিয়ে ভারতের মৃত্যুসংখ্যা সম্পর্কে মাথা ঘামান তাঁরা কেউই ভারতের জীবন নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু যাই হোক, মেলায় টিনের চেয়ারে বসে সম্মুখে বাঁশের টেবিলের উপর পদ্মপাতার উপর নানাবিধ মিষ্টান্ন খেতে যে কি আরাম লাট দপ্তরের বড় সাহেব একদিনও যদি রসাস্বাদন করতেন তবে মেলায় খাবার খাওয়ার বাধ্যতামূলক এর একটা অর্ডিনান্স্ জারি করতেন।

গ্রামের মেলায় এটার অন্য মূল্য আছে।

গ্রামে সাধারণতঃ মিষ্টির দোকান থাকে না, যেখানে থাকে সেখানেও সব সময় সকল রকমের ভাল মিষ্টি পাওয়া যায় না, সুতরাং গ্রামে মিষ্টি একটা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য! খাওয়ার পর্ব্ব শেষ হবার পর কৃষ্ণদাস কতকগুলো কমলা লেবু কিনে সকলকে দিল, খাওয়ার পর লেবু খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে কৃষ্ণদাস সকলকে একটানা উপদেশ শুনিয়ে গেল; কমলা লেবু সোনাপুরে এই মেলার সময়ই মাত্র আসে এবং তখনই লোকে কিছু কিনে খায়।

"ভূতনাথ, এবার চল জিনিসগুলো গাড়ীতে রেখে আসি—তারপর মেয়েদের জিনিসগুলো কিনে ফেলতে হবে—চল একটু পা চালিয়ে।"

সকলে গেল গাড়ীর কাছে; সেই মন্দিরের পাশে প্রান্তরের প্রান্তভাগকে দখল করে' মেলায় আগত গরুর গাড়ী বিশ্রাম করে, কতক আসে, কতক যায়, তবু সেখানে বিশ্রামরত গাড়ীর সংখ্যা এককালীন দুই শতের বেশী হবে, গাড়ীগুলো মহিষ কিংবা বলদের কাঁধ থেকে খুলে মাটিতে রাখা থাকে, বলদগুলোর সম্মুখে বাঁশের বোনা পাত্রে কিংবা মাটির পাত্রে খাবার দেওয়া হয়, প্রথমে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে গলাধঃকরণ করে' পরে তারা বসে পড়ে এবং নদীর দিকে মুখ করে' চোখ বন্ধ করে' জাবর কাটতে

থাকে, মেলার কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত! মহিষগুলো ছাড়া পাওয়া মাত্রই এই শীতেও সম্মুখের নদীতে দেহটি ডুবিয়ে নাকের ছিদ্র দুটি জলের ওপরে রেখে জাবর কাটে। মেলা বসবার সপ্তাহ খানেক আগে ও পরে এই স্থানটুকু এই সব গাড়ীতে, তার বাহনের ভুক্তাবশিষ্ট ও গোময় প্রভৃতি দ্রব্যের সংমিশ্রণে বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করে।

কৃষ্ণদাস নিজের ও ভূতনাথের জিনিসগুলো গাড়ীতে রাখল। গাড়োয়ান গাড়ীর নিকটে ছিল সে প্রভুকে দেখে ছুটে এসে সব জিনিসগুলো দেখে নিল।

"ওরে নবীন, তোকে যে আর একটা গাড়ী ভাড়া করতে বলেছিলাম—করেছিস্?"

"আজ্ঞে করেছি কত্তা! আমাদের গ্রামের রহিমই ত এসেছে, এইযে তার গাড়ী—ওকেই বললাম।"

"বেশ করেছিস্—জিনিসগুলো তা'ল ওর গাড়ীতেই রাখ, টোপর নেই অনেক মাল আঁটবে ওতে—সব মাল ওতেই তুলে দে—আর নতুন বলদ দুটো ঐ গাড়ীর পিছনে বেঁধে দে—দিব্যি চলে যাবে সঙ্গে!"

আমি সব জিনিসের ব্যবস্থা করছি কত্তা। আপনাকে কিছু দেখতে হবে না—আপনারা কি এখনই রওনা হবেন কত্তা!" রহিম জিজ্ঞাসা করল।

"তুমি বেশ আছ রহিম! রওনা এখন হ'লেই হল। এখনও আমাদের জিনিস একটাও কেনা হল না।" লতার কথায় রহিম লজ্জিত হ'য়ে বলে—

"আমি জানতাম না মা ঠাকরণ!"

"ওহো! তোমাদের জিনিস বুঝি এখনও কেনা হয়নি বৌদি! আমি একেবারেই ভুলেই গিয়েছিলাম!" ভূতনাথ লতাকে বলল।

"তাতো ভুলবেই ঠাকুরপো—নিজেদের জিনিস হ'য়ে গেছে যে।"

"আচ্ছা আচ্ছা এখন ঝগড়া না করে' চল তোমাদেরই জিনিস কেনা যাক্। সুরো বিবেক—তোরা কি সব কিনবি রে?" কৃষ্ণদাস ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করল। বিবেক ও সুরো এতক্ষণ তাদের কথায় কান না দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করছিল, পিতার প্রশ্নে বিবেক উত্তর দিল—

"বাবা আমরা আর মেলায় যাব না—আমরা এখানেই থাকি, তোমরা গিয়ে জিনিস কিনে আন—!"

"বেশ, থাক, আমরা যাব আর আসব।"

"না না, থাকবে কি ওরা! ছেলে মানুষ একা একা এখানে থাকবে, সামনে নদী, হুট্ করে' কোথায় না কোথায় চলে যাবে এসে হয়ত খুজেই পাব না—ছেলের যত দেশছাড়া কথা!" লতা প্রতিবাদ জানায় স্বামীর মতের।

"না মা, আমরা কোথাও যাব না—চুপ করে এখানেই বসে থাকব, নবীন থাকল, রহিম থাকল—তোমার যত অদ্ভুত ভয় মা! সুরোকে আমি দেখব।"

"তা থাক না ওরা! না হয় চুপ করে' গাড়ীতে বসে থাক—নবীনরা ত থাকল। এই ধূলোর মধ্যে ওদের বেশী যাওয়াও ঠিক না—!"

"থাক না মা—আমি ত আছি! দাদাকে দিদিকে একপাও নড়তে

দেব ভেবেছেন--?" নবীন নিজের বাড়ীর চাকর, সে কর্ত্রীকে অভয় দেয়।

"তাহ'লে তোরা গাড়ীতে ওঠ—গাড়ী থেকে একপাও নড়্‌বি না—!" লতার আদেশ হ'ল, বিবেক কি একটা ইসারা করাতেই স্বরো তার সঙ্গে চুপ করে' গিয়ে নিজেদের গাড়ীতে বসল। লতা নবীন ও রহিমকে বার বার সাবধান করে', ছেলেদের জন্যে কি কি জিনিস কিনবে তার তালিকা ও প্রলোভন বার বার শুনিয়ে মেলার ভিতরে ঢুকল।

এতক্ষণ বিবেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্মুখের মন্দিরের ইতিহাস স্বরোকে শোনাচ্ছিল, যতটা সে লোকের মুখে শুনেছে, যতটা তার মনে আছে তার সঙ্গে তার নিজের কল্পনপ্রসূত অধিকাংশটুকু সংযোগ করে' দিয়েছিল, স্বরো বিস্মিতনয়নে বিবুদার সজাগ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে কাহিনী শুনছিল। অদ্ভুত মন্দির ত এটা!

গাড়ীতে বসে বিবেক সেই গল্পের অবশিষ্ট অংশটুকু বলতে লাগল।

"দাদাবাবু, তোমরা কিন্তু গাড়ী থেকে একপাও নেম না—তাহ'লে আমি মাঠাকরুণকে বলে দেব—!"

"না নবীন, আমরা নামব না। আচ্ছা নবীন তুমিও একটু আমাদের কাছেই বস না, তোমার কাছে আমরা ঐ মন্দিরের গল্পটা শুনি!"

"এই মন্দিরের গল্প! আচ্ছা শোন বলছি—দাঁড়াও এক ছিলিম তামাক সেঁজে নি—" রহিম তখন অল্পদূরে অন্য একজন গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, নবীন তামাক সেজে গাড়ীর মাথার উপর ঘোড়ার মত বসে বিবেকদের দিকে মুখ করে' মন্দিরের গল্প জুড়ে দিল, কি জানি কেন মন্দিরটার গল্প নবীনের বড় ভাল লাগে, বিবেকের সঞ্চয়ও

অধিকাংশ তারই কাছ থেকে, এ গল্প যেন নবীনের কাছে কখনও পুরোণ হয় না—সত্যি হবার কথাও নয়।

ধীরে ধীরে নবীন হুঁকো টানে চোখ বন্ধ ক'রে, তার তালে তালে নবীন চলে যায় বহুদূর এক সময়ে যেন ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলীর মাথায় চড়ে—বিবেক সুরো অবাক্ হ'য়ে তার গল্প শুনে। সেই পুরাতন গল্প, মন্দিরের কথা, তার স্থাপনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়ান অদ্ভুত সব কাহিনী, তার বয়স নির্ণয়নের চেষ্টা, বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন ইতিহাসের ক্রমশ কাহিনী, তার দেবতার ইতিহাস, দেবতার মাহাত্ম্যর কথা, মন্দিরের পূজারীর কথা নবীন সুন্দরভাবে বলতে পারে—মনে হয় যেন সে নিজের চোখে প্রত্যেকটি খুঁটিনটি ঘটনা দেখেছে। কতবার যে সে এই কাহিনী বিবেককে বলেছে তার অন্ত নাই, কিন্তু বিবেকের কাছে মনে হয় যেন সে প্রত্যেক বারই নতুন শুনল কাহিনীটি। সুরোও অবশ্য এই মন্দিরের কাহিনী কিছু কিছু শুনেছে কিন্তু নবীনের মুখে সে এই প্রথম শুনল।

তিন জনেই তন্ময় হ'য়ে কাহিনী বলছে ও শুনছে—ক্রমে ক্রমে তাদের সম্মুখ থেকে মেলার আবহাওয়া অদৃশ্য হল, তারা উপস্থিত হ'ল সেই স্থানে, সেই সময়ে যখন এই মন্দির প্রথম স্থাপিত, তার পর ধীরে ধীরে তারা কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে আছে—! নবীনের কল্কের আগুন কখন নিভে গেছে, সে মাঝে মাঝে শুধু হুঁকোটায় টান দিচ্ছে—ফুরুক্—ফুরুক্—!

"দেখি দাদা, চিলিমটা একটু দাও—এযে একেবারে পানি করে দিয়েছ নবীনদা—!" রহিমের ডাকে নবীন ফিরে আসে বাস্তবে, হুঁকোটা নামিয়ে কল্কেটার বুকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে রহিমের হাতে দিয়ে দিল।

"নবীন, আমরা একটু মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখে আসব— ওখানে একটু দাঁড়িয়েই চলে আসব।" বিবেক মিনতি জানাল। প্রথমে বললে নবীন হয়ত কিছুতেই অনুমতি দিত না কিন্তু তখন তার অতীতের নেশা সম্পূর্ণ না কাটাতে বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারেই বলল—

"আচ্ছা যাও।"

নবীনের অনুমতি পাওয়া মাত্রই বিবেক সুরোর হাত ধরে টেনে লাফিয়ে পড়ল গাড়ীর উপর থেকে।

"এক্ষুণি কিন্তু ফিরে এস দাদাবাবু—মাঠাকরুণ দেখলে আমায় আর আস্ত রাখবেন না" তখন তারা দুজন এগিয়ে গেছে খানিকটা, পিছনে না তাকিয়ে বিবেক শুধু একবার বলে গেল "আচ্ছা"—

তাদের গাড়ী থেকে প্রায় দশহাত দূরে মন্দিরটা। বিবেক ও সুরো এসে ঠিক মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াল, সেটাকে কেন্দ্র করে' হাত পঞ্চাশের মধ্যে কোন গাড়ী কেউ রাখনি, বোধ হয় মন্দিরের মাহাত্ম্যের জন্য কিংবা তার দেবতার ভয়ে। মেলার কোলাহলের মধ্যেও মন্দিরটা নিজস্ব একটা স্তব্ধতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মেলার কোলাহল যেন তার নিকটে আসতে পারছিল না।

গুল্মলতা পরিবেষ্টিত অতীত সভ্যতা পরিমণ্ডিত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মুখে, যে সব লতা মন্দিরটিকে ঘিরে আছে তারা সব বন্য, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে মন্দিরটিকে ঘিরে, প্রচুর ফুল ছড়িয়ে পড়েছে মন্দিরের উপর। মন্দিরের সম্মুখে প্রকৃতি নিজেই প্রতিদিন পূজা দেয় মহেশ্বরকে! দুয়ারে বৃহৎ তালাটি কালের ঘাতে ঘাতে একটা বিরাট জমাট ইঙ্গিত বলে মনে হচ্ছিল।

"বিবুদা—এইটাই সেই তালা নবীন যার কথা বলছিল?" সুরো জিজ্ঞাসা করল।

"হুঁ—"!

"কেউ খুলতে পারে না এই তালাটাকে?"

"না।"

"এ আর এমন শক্ত কি! ভেঙ্গে ফেললেই ত পারে।" সুরোর এই কথায় বিবেক এবার চমকে উঠলো।

"ভেঙ্গে ফেলবে কিরে। তুই কী পাগল হলি? ভাঙ্গবে কে? তার প্রাণের ভয় নেই?"

"তবে কে খুলবে এই তালাটা? চিরদিন এমনি বন্ধই থাকবে? আগে ত বন্ধ থাকত না; কে একজন সাধুর কাছে নাকি এর চাবি ছিল শুনলে না নবীন বলল। কি জানি বাপু সেই সাধুটা চাবিটা দিয়ে গেলেই ত পারত কাউকে, ঠাকুরের পূজোটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে গেল।"

"চাবি কী যাকে তাকে দিয়ে যেতে পারে! যে সে লোক কি এই তালা খুলতে পারে—সে এক অসাধারণ শক্তির দরকার। দেখিস এ তালা আমি খুলব!" শেষ কথাটা বলতে বিবেকের চোখ মুখ যেন এক অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিল। স্থির দৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ ইচ্ছাটা বলে ফেলল সে উত্তরের অপেক্ষা না করে।

"সে কি কথা! তুমি কি সাধু হবে নাকি?"

"দুর পাগলি সাধু হবে কেন! শুধু কি সাধুরাই খুলতে পারে!"

"তবে? নবীন ত তাই বলল।"

"নবীন ওটা ভাল জানে না, আমি একজনের কাছে শুনেছি, কার কাছে

শুনেছি ঠিক মনে পড়ছে না হয়ত স্বপ্নেও হতে পারে—আর একজন খুলতে পারে—!!"

"সে কে বিবুদা—?"

"য়্যানার্কিষ্ট্! দেখিস আমি একজন য়্যানার্কিষ্ট্ হব!" বিবুদার চোখ দুটো জ্বলতে দেখল স্যুরো।

"সে কে বিবুদা—?"

"য়্যানার্কিষ্ট মানে জানিস না! রাজদ্রোহী—আমি কয়েকটা বই পড়েছি পৃথিবীর য়্যানার্কিষ্টদের বিষয়ে—তারাও দেবতা রে স্যুরো!"

"রাজদ্রোহী মানে কি বিবুদা—?"

"যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে—তারাই। যারা রাজার রাজত্বকে তুলে দিতে চায়।"

"রাজা ত আমাদের জমিদারবাবু—তুমি তার রাজত্ব তুলে দিতে চাও বিবুদা? তাহ'লে আমাদের ইস্কুলও যে উঠে যাবে।"

"তা যাক। তবুও ওর রাজত্ব তুলে দিতে হবে।"

"তুমি এই তালা খুলে কি করবে বিবুদা?"

"তালা খুলে মন্দিরের ভিতরে ঢুকব, এখান থেকে আমার দেশকে স্বাধীন করব—তারপর—

"তারপর?"

"তারপর? যেদিন তালা খুলবার অধিকার পাব সেই দিনই তোকে নিয়ে এসে এই মন্দিরের ভিতরে বিয়ে করব—!!!"

"ধ্যুত্—!!!" স্যুরো প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল। তার বিবুদা এ

একটা কি কথা বলল, যে কথার না আছে মানে না আছে মাথা! সুরোর এই প্রতিবাদের কোন উত্তরই দিল না বিবেক, কি মনে করে সে এই অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করল সে নিজেই জানে না, সুরোর প্রতিবাদ সুতরাং তার অন্তর স্পর্শও করল না, সে প্রতিবাদ হয়ত মৃদু আঘাত করে' প্রতিধ্বনি তুলল ধাতব বিরাট তালাটির বুকে, হয়ত বিবেকের অভিমত, সুরোর প্রতিবাদ মন্দিরে আবদ্ধ সৃষ্টিমুক্ত দেবতার বুকে বিরাট প্রতিধ্বনি তুলল।

পরক্ষণেই কিন্তু বিবেক সে কথাটার কথা ভুলে গেল। সেইদিন রাত্রে সুরো স্বপ্ন দেখল যেন সেই মন্দিরের তালা বিবুদা খুলে ফেলেছে, হাতে পায়ে তার লৌহ শৃঙ্খল, তালা খুলবার পর বিবুদা মন্দিরে প্রবেশ করল পিছনে সে নিজে ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করতেই দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, তারপর স্বয়ং মহাদেব এলেন মা কালীকে সঙ্গে করে, মহাদেব বিবুদার হাত পায়ের শিকল খুলে দিলেন, বিবুদা মাকালীর খড়্গ থেকে রক্ত নিয়ে তাঁর সিঁথিতে টেনে দিল। দুজনেই পরে মহাদেব ও মা কালীর পায়ে প্রণাম করল।

পরদিন সকালে স্বপ্নটির কথা সুরোর মনে পড়ল; প্রতিদিন একবার করে মনে পড়ত কিন্তু কোনদিন কাহাকেও বলে নাই এমন কি তার বিবুদাকেও না।

একটা তথ্য আমি বরাবর বলে এসেছি, বলে এসেছি লেখক হিসাবে, বলে এসেছি নিজের পার্থিব জীবনের পদে পদে, লেখক হিসাবে যখন বলেছি তখন এক সম্প্রদায়ের পাঠককে তুষ্ট করতে পেরেছি কিনা জানি না, তবে নিজের জীবনে যখন বলেছি তখন সেই সম্প্রদায়ের পাঠক ও

শ্রোতাকে অসন্তুষ্ট করেছি সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি। আমার সেই পুরাতন কথাটি আবার বলি, বলবার পূর্ব্বে ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন মনে করি না, কোন দিন করি নাই।

প্রেমের স্পর্শ মেয়েদের মনের উপর যত সহজে এবং যত অল্প বয়েসে পড়ে পুরুষের মনের উপর তত সহজে পড়ে না, মাছি যেমন কলেরার বীজ সহজে এবং সর্ব্বাপেক্ষা পটুতার সহিত বহন করে' কোটিগুণ বৃদ্ধি করাতে পারে, দুধ যেমন যক্ষার বীজ ধারণ করতে শ্রেষ্ঠ পটু, নারী মশাই নাকি ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করতে একমাত্র সক্ষম—নারীও তেমনি প্রেমের বীজ ধারণ করতে বা গ্রহণ করতে সর্ব্বাপেক্ষা পটু! উপমাগুলোর জন্য অবশ্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি—তথ্যের জন্য নয়। এটাকে অবশ্য একটু ভাল উপমা দিয়েও বলা যায়! রূপকথার কাহিনী পড়েছেন আপনারা, সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদের হীরকখচিত কক্ষে সুপ্তা ছিল রাজকুমারী, রাজকুমার নয়, সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির সামান্যতম স্পর্শে জাগরিতা হল সে, অর্থাৎ তার অন্তরে প্রেমের স্পর্শ লাগল সুপ্তা অবস্থাতেই, উঠেই দেখল সম্মুখে রাজকুমার—বৎস্! তার পরের ইতিহাস সর্ব্বজন বিদিত! একটু ভাল উপমা দিয়ে তথ্যটি বুঝাবার জন্য আমি নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভবিষ্যতে রাজদ্রোহী হবার স্বপ্ন চিত্তে নিয়ে, সেই স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে বিবেক সুরোকে যে কথাটি মন্দিরের সম্মুখে বলেছিল সেটা তার মনে বিন্দুমাত্র স্থান পায় নাই, মন্দির প্রাঙ্গণের শতাব্দীপুণ্যপূত আবহাওয়াকে কিছুমাত্র আঘাত দিতে পারে নাই। বিবেকের মন তখন মন্দিরস্থ ধ্যানগম্ভীর স্বয়ম্ভুর তপস্যার চেয়ে ভবিষ্যতের দেশাত্মবোধে সমাহিত, সুরোকে বলা কথাটি হয়ত বা শুধু তাকে রাগাবার জন্যেই, কিংবা কথাবার্ত্তার

পূরকমাত্র! কিন্তু সেই সামান্য কথাটি কিশোরীর মনে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ লাগাল, তার মনস্তত্ত্বের। বিশ্লেষণ করলে হয়ত বা দেখা যেত যে শিশু সরস্বতীর ভিতরে নিঃশব্দে একটি নারীর জন্ম হ'ল। সুরো সেই কথার পর কয়েকদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখল, প্রাতে সে স্বপ্ন মনে রাখল, কয়েকদিন বিচ্ছিন্নভাবে সেটা নিয়ে গ্রন্থিহীন আলোচনা করল এবং মনে ক'রে তার বিবুদাকে বলতে লজ্জা পেল।

সুতরাং নিজের অজ্ঞাতে সেদিন নারী সরস্বতীর জন্ম হ'ল।

—শেষ—